মাকে—

সূচীপত্র

টিউলিপ মেনিয়া

বর্ণে, গুণে, বৈচিত্র্যে অনন্যসাধারণ ফুল নয় এই টিউলিপ।

কিন্তু তা না হলেও প্রায় তিন শত বছর আগে এই টিউলিপই হল্যাণ্ড দেশে বিপুল সমাদর ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সে ইতিহাস বিস্ময়কর, অসাধারণ। হল্যাণ্ডের ধনী নির্ধন সকলেই টিউলিপের নেশায় মেতে উঠেছিল আর মণি-মুক্তার দরে বিকিয়েছিল এই ফুলের বাল্ব বা কন্দ। একটি ফুলের প্রতি আকর্ষণ, একটি ফুলের বাল্বের জন্য অপরিমেয় অর্থ ব্যয় হল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক জীবনেও সেদিন এনেছিল এক যুগান্তর।

ষোড়শ শতাব্দীতে তুরস্ক অঞ্চল থেকে টিউলিপ প্রথম আসে পশ্চিম ইউরোপে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই হল্যাণ্ডবাসীদের চিত্ত জয় করে ফেলে এই টিউলিপ। কনরেড গেস্‌নার বিদেশ থেকে হল্যাণ্ডে ফিরে এসে টিউলিপের বিস্ময়কর গুণাবলীর প্রশংসা এমন নিপুণভাবে করলেন যে অচিরেই ওলন্দাজেরা এই ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলো। যারা বিত্তশালী তারা কনস্ট্যানটিনোপোল পাঠালো তাদের লোকজনকে এই ফুলের বাল্ব সংগ্রহ করতে। হল্যাণ্ডের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে টিউলিপের চাষ আরম্ভ হয়ে গেল আর সারা দেশটই মেতে উঠলো টিউলিপ ব্যবসায়।

ফুলের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চাষ, চাহিদা ও দাম বাড়তে লাগলো। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা আকাশ-ছোঁয়া দামেই টিউলিপের বাল্ব কিনতে লাগলো। নানা শ্রেণীর বিচিত্র দুর্লভ-দর্শন টিউলিপের আবির্ভাব ঘটলো বাগানে। ব্যবসায়ী,

সংগ্রাহক, ফাটকা-বাজদের মরশুম পড়ে গেল। দর চড়তে লাগল। এক বিত্তবান সৌখীন ভদ্রলোক ৪০টি টিউলিপ বাল্বের জন্যে হাসিমুখে এক লক্ষ ফ্লোরিন ব্যয় করলেন। ১৬৩৪ সালের এই ঘটনা।

অ্যাডমিরাল লিইপকিন নামের এক জাতীয় টিউলিপ যার ওজন ছিল ৪০০ গ্রেনের অনেক কম, তার দাম উঠেছিল ৪৪০০ ফ্লোরিন। অ্যাডমিরাল ভ্যান ডার এইক নামের আর একটি টিউলিপ (ওজন ৪৪৬ গ্রেনের কম) বিক্রী হয়েছিল ১২৬০ ফ্লোরিনে। ভাইসরয় নামের অন্য একটি জাতের টিউলিপের ৩০০০ ফ্লোরিন দাম উঠেছিল। সবচেয়ে মূল্যবান ও সমাদৃত টিউলিপের নাম সেম্পার আগস্টাস্—এটার ওজন ছিল ২০০ গ্রেনের অনেক কম। কিন্তু বিক্রী হয়েছিল ৫৫০০ ফ্লোরিন দামে। এইরূপ চড়া দামে বিক্রী হয়েছিল আরও বহু প্রকারের টিউলিপ-বাল্ব।

মানটিং নামে এক লেখক হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এক বই লিখে গেছেন এই টিউলিপ মেনিয়া সম্বন্ধে। তাঁরই বিবরণ থেকে জানা যায়, ভাইসরয় নামের একটা দুর্লভশ্রেণীর বাল্ব সংগ্রহ করার জন্য এক টিউলিপপ্রেমিক একজন লোককে দিয়েছিলেন চারটা মোটা ষাঁড়, আটটা মোটা শুকর, বারটা মোটা ভেড়া, দু-টন মাখন, এক হাজার পাউণ্ড পনীর, চার টন বিয়ার, দুই পিপে মদ, একটা সম্পূর্ণ শয্যা, একপ্রস্ত পোশাক আর একটা রূপোর গ্লাস—যার মোট মূল্য হচ্ছে সেকালের আড়াই হাজার ফ্লোরিন। অর্থাৎ সামান্য একটা বাল্বের জন্য ভদ্রলোক তাঁর যথাসর্বস্ব নিঃশেষিত করে ফেলেন।

১৬৩৬ খৃষ্টাব্দের কথা। এই সময়েই টিউলিপ মেনিয়ার চরম প্রকাশ ঘটে হল্যাণ্ডে। সারা দেশটাই মেতে ওঠে এই নেশায়। ধনী, নির্ধন, জমিদার, কৃষক, সমাজের সর্বস্তরের স্ত্রী-পুরুষ এমনকি ঝি, চাকর পর্যন্ত এই নেশায় সংক্রামিত হয়। কেউ বাড়ি বিক্রি করে, কেউ বা বাড়ি বন্ধক দিয়ে, কেউ বা জমি-জমা, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত করে এই ফুলের ব্যবসায় টাকা খাটাতে শুরু করে।

বিদেশীয়েরাও এই ফাটকাবাজিতে মেতে ওঠে এবং তার ফলে হল্যাণ্ডে এই টিউলিপ ব্যবসা থেকে বেশ অর্থাগমও হতে থাকে।

এই ব্যবসা জনমনের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে এবং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পায় এতো বেশি যে ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেবার জন্য কতকগুলো নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ হয়। দেশের চারিদিকে দেখা দেয় টিউলিপের বাগান, আর টিউলিপের বাজার। সারা দেশটায় শুধু টিউলিপের কথা, টিউলিপের জয়গান। স্থানে স্থানে নোটারিও নিযুক্ত হয়। স্টক এক্সচেঞ্জে নিয়মিতভাবে টিউলিপ ক্রয়-বিক্রেয়র দাম প্রকাশিত হতে থাকে। বিপুল অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতাও বাড়ে দেশে।

এই সময়ের বহু কৌতুককর কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। একদিন এক নাবিক এল তারই এক ব্যবসায়ী বন্ধুর বাড়ি। ডেস্কের ওপর ছিল একটা সুন্দর টিউলিপের বাল্ব। এই নাবিকের পেঁয়াজ খেতে খুব ভাল লাগতো। বাল্বটা দেখে সে ভাবলো ওটা একটা পেঁয়াজ এবং খুব ভাল জাতেরই পেঁয়াজ, তাই তাড়াতাড়ি ওটাকে পকেটস্থ করে বন্ধুর বাড়ি থেকে সরে পড়লো।

এর পর এল সে এক পোতাশ্রয়ের কাছে, পেঁয়াজটা দিয়ে প্রাতরাশ সেরে ফেলবে নিরালা একটা জায়গায় এই ভেবে। এদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেছে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের বাড়িতে। কোথায় গেল তার প্রিয় টিউলিপ বাল্বটি? কে চুরি করলো তিন হাজার ফ্লোরিন দামের এই দুর্লভ জিনিসটি? হাহাকার করে উঠলো ভদ্রলোক। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল সারা বাড়িটা কিন্তু কোথাও সন্ধান মিললো না তার এই মূল্যবান সম্পদটার।

লোক ছুটলো দিকে দিকে। সকলেরই সন্দেহ হল এই নাবিকের ওপর, সেই অতিথি-বন্ধুর ওপর। তাই লোকজন নিয়ে তড়িৎগতিতে ছুটলো ব্যবসায়ী সমুদ্রের ধারে। সেখানে গিয়ে যা দেখলো তাতে তার হল চক্ষুস্থির। নাবিক তখন মনের আনন্দে রুটির সঙ্গে সেই

মহামূল্য টিউলিপের বাল্বটি চিবিয়ে খাচ্ছে। সবটাই তখন তার মুখের ভেতরে।

হৈচৈ পড়ে গেল বন্দরে। তাকে ধরে নিয়ে গেল ব্যবসায়ী থানায় আর টিউলিপ খাবার জন্যে তাকে যেতে হলো হল্যাণ্ডের এক জেলখানায়।

এই টিউলিপ সম্বন্ধে এই সময়ের অন্য একটি সরস কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়।

এক ইংরেজ বোটানিস্ট গবেষণার কাজে ব্রতী হয়ে এলেন হল্যাণ্ডে। টিউলিপের নেশা যে সারা দেশটাকেই তখন পেয়ে বসেছে তা তাঁর জানা ছিল না। টিউলিপ সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ ধারণা ছিল না।

একদিন তিনি এলেন এক ওলন্দাজ ভদ্রলোকের বাগানে। নানা জাতের ফুল দেখে আকৃষ্ট হলেন তিনি আর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠলো তাঁর মনে। পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে একটা টিউলিপের বাল্বকে টুকরো টুকরো করে কেটে দেখতে লাগলেন তিনি। কাটা শেষ করে ফেলেছেন এমন সময় সেই বাগানের মালিক ছুটে এলো তাঁর কাছে।

'কি করছ? কি করছ?' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লো ভদ্রলোক।

'একটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে দেখছি'—উত্তর দিলেন বোটানিস্ট।

'এ আমার বহুমূল্য অ্যাডমিরাল ভ্যান ডার এইক।' গর্জে উঠলো ভদ্রলোক।

'ও তাই নাকি, তাহলে তো ভালই হলো, ঐ নামটা আমাকে নোট করতেই হবে'—এই বলেই পকেট থেকে নোটবই আর পেন্সিল বের করে ফেললেন।

ভদ্রলোক রেগে অগ্নিশর্মা। 'সর্বনাশ করেছ, সর্বনাশ করেছ' বলতে বলতে তার গলার কলার ধরে চীৎকার করতে লাগলো।

তাকে টেনে নিয়ে গেল কোর্টে। কোর্টে গিয়েই বোটানিস্ট বুঝতে পারলো অদ্ভুত পেঁয়াজ মনে করে যে বাল্বটা সে কাটছিল সেটা পেঁয়াজ নয়, সেটা টিউলিপের বাল্ব আর তার তখন বাজারদর চার হাজার ফ্লোরিন। জেলে ঢুকতে হয়েছিল বোটানিস্টকে সেদিন। এই অভিজ্ঞতার পর ভদ্রলোক আর কখনও জীবনে বোটানি-চর্চা করেনি।

কোন হুজুকই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। একটা ফুলের জন্য দেশব্যাপী এই মেনিয়া, এই পাগলামি বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ক্রমে ভাটা পড়তে লাগলো এই নেশার স্রোতে। ধীরে ধীরে লোকের মনে একটা বিশ্বাস জন্মালো যে এই লাভ ও লোভের ব্যবসায়, এই অস্বাভাবিক ফাটকাবাজির ব্যবসায় কেউ না কেউ ঠকবেই। ক্রমে টিউলিপের দাম কমতে লাগলো। প্রথমে ধীরে, তারপর দ্রুত।

ধনী লোকেরা নতুন নতুন জাতের বাল্ব কেনা বন্ধ করে দিল। যা তাদের বাগানে ছিল তাড়াতাড়ি বেচে দিল কম দরে। সর্বসাধারণের আর টিউলিপের ওপর মোহ রইল না, মেনিয়া থেকে মুক্ত হল ওলন্দাজেরা। টিউলিপ অধিকর্তাদের মধ্যে একটা ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো দেশময়। টিউলিপের ফাটকবাজি বন্ধ হল দেশে।

এর ফল হল মারাত্মক, অত্যন্ত শোচনীয়। এক বিরাট অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল দেশে। প্রতিদিন বাড়তে লাগলো দেউলিয়ার সংখ্যা। যারা টিউলিপের ওপর সর্বস্ব পণ করেছিল তাদের হল সর্বনাশ। শত শত লোক কপর্দকশূন্য হল। ধনীরা বুঝতে পারলো তাদের সম্পত্তি নেই, আছে কেবলমাত্র কয়েকটা টিউলিপের বাল্ব যার বাজারে আর কোন চাহিদা নেই, নেই কোন মূল্য। হাহাকারে ভরে উঠলো সারা দেশ। সর্বত্র জনসভায় আলোচিত হল এই সমস্যা ও সংকটের কথা। জনসাধারণের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে আর এই দুর্দশার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার

উদ্দেশ্যে গভর্ণমেন্টের কাছে বহু আবেদন নিবেদন পৌছলো। তিন মাস ধরে গভর্ণমেন্ট এই সংকটময় পরিস্থিতি, এই নিদারুণ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজলো, কিন্তু এ সমস্যার সমাধান গভর্ণমেন্টও করতে অক্ষম হল। হল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করতে কেউ পারলো না। সর্বগ্রাসী টিউলিপ মেনিয়ার কবলে পড়ে হল্যাণ্ডকে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেদিন তা থেকে উদ্ধার পেতে এই দেশের সুদীর্ঘ সময় লেগেছিল।

ইংরেজী অভিধানের দুটি শব্দ টিউলিপোমেনিয়া আর টিউলিপোমেনিয়্যাক হল্যাণ্ডের এই অধুনা-বিস্মৃত ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর কাহিনীর পরিচয় বহন করে।

এপ্রিল ফুল

একদিন রাত্রে পিটার্সবার্গ নগরে হঠাৎ বিপদসঙ্কেত ঘণ্টা বেজে উঠল। আতঙ্কিত হল নাগরিকেরা। ভাবল, কোথাও বোধহয় বিরাট একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। শয্যা ত্যাগ করে অগণিত নরনারী ছুটে এল রাস্তায় রুদ্ধশ্বাসে—কোথায় কি হল দেখবার জন্যে। কিন্তু কি দেখল তারা? কোন দুর্ঘটনা, কোন বিপদ? না, তা নয়। তারা দেখল পার্কের মাঝখানে একটা বিরাট পাত্রের ওপর জ্বলছে স্তূপীকৃত কয়লা, আর তার আলো ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। রুশ-সম্রাট পিটারের আদেশেই এই আগুন জ্বালানো হয়েছে। ভীত-সন্ত্রস্ত নর-নারীরা যখন এই পার্কের ধারে এসে ভীড় করল, তখন প্রহরীরা তাদের অভিনন্দন জানাল, "এপ্রিল ফুল, এপ্রিল ফুল"। এ কি ভীষণ রসিকতা!

বলা বাহুল্য, এপ্রিল মাসের প্রথম দিনে নানান দেশে নানা রকম রসিকতা করার প্রথা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। বিশেষত, পাশ্চাত্য দেশে ১লা এপ্রিলে বোকা বানানোর রীতি আজও বেশ জনপ্রিয়। ইংলণ্ডের কথাই বলা যাক। এইদিন রাস্তার ধারে পথিকদের চোখে পড়ে একটা সুদৃশ্য প্যাকেট। মনে হয় এর মধ্যে হয়ত কোন মূল্যবান জিনিস আছে। কেউ যদি একে কুড়িয়ে নিতে যায়, সে ঠকবেই, কেন না, এর ভেতরে আছে শক্ত একটা ইঁট। আবার কেউ যদি অবজ্ঞাভরে লাথি মেরে এটাকে সরিয়ে দেয় তাহলে তার পায়ে লাগবে চোট। রাস্তায় রাস্তায় ছেলেরা রসিকতা করে বলে, "ও মশাই, আপনার কোটের পেছনে ওটা কি?" ভদ্রলোক দেখেন তাঁর কোটের পেছনে পিন্ দিয়ে আঁটা একটুকরো কাগজ। আর ছেলের দল তখন খিল্‌খিল করে হেসে বলে, "এপ্রিল ফুল"। এইসব স্থূল রসিকতা ইংলণ্ডে আজও চলে।

আমেরিকাতেও ১লা এপ্রিল বিচিত্র ধরনের রসিকতার বিশেষ চলন আছে। সেখানে রাস্তায় ছেলে-মেয়েরা পুরানো টুপীর নীচে একটা ইঁট লুকিয়ে রাখে। ফুটপাথের পাশে এইরকম জিনিস্ পড়ে থাকতে দেখলে পথচারীরা পা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তখন তাদের পায়ে লাগে চোট, দু-চারটে আঙুলও যে জখম হয় না তা নয়। ছোটদের কিন্তু এতেই প্রচুর আনন্দ, তারা তো অনেককেই "এপ্রিল ফুল" করতে পেরেছে। কেউ কেউ আবার পথের ধারে একটা মানিব্যাগকে সরু দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দেয়। কেউ যদি তাকে তুলে নিতে যায়, তখনই দড়িটাকে এদিক-ওদিক টেনে নিমেষের মধ্যেই ব্যাগটাকে সরিয়ে নেয় তারা। এইরূপ নানা ধরনের স্থূল রসিকতা চলে এইদিন। পিতামাতার সঙ্গেও ছেলেমেয়েরা রসিকতা করতে ছাড়ে না। প্রাতরাশ খাবার সময় বাবাকে বলে, "বাবা, তোমার মুখে ওটা কি?" মাথা ও মুখে হাত বুলিয়ে যখন সে কিছুই পায় না, তখন ছেলে হেসে ওঠে, বলে, "কেন, ঐ যে তোমার নাক।" এতে অবশ্য ছেলের বাবা রাগ করেন না, কারণ, তিনিও তো ছেলেবেলায় তাঁর বাবাব সঙ্গে ১লা এপ্রিল এইরকম রসিকতাই করতেন। এদিক থেকে সব দেশকে টেক্কা দিয়েছে এই আমেরিকা। এখানে এখন "এপ্রিল ফুল ক্যাণ্ডি" প্রচুর বিক্রী হয়। এই লোভনীয় মুখরোচক খাবারটি খেলনার দোকানে পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায়, ছেলেমেয়েরা ১লা এপ্রিল পরম আনন্দে এই খাবারটি খেয়ে থাকে।

এতক্ষণ তো সাম্প্রতিক কালের ইংলণ্ড-আমেরিকার ১লা এপ্রিলের রসিকতার কথা বলা হল, এবার একটু এইসব দেশের অতীত ইতিহাসের পাতা ওল্টানো যাক।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এক মজার ঘটনা ঘটে। এই নগরীর কয়েকজন রসিক বহুসম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে "এপ্রিল ফুল" বানাবার এক পাইকারী ব্যবস্থা করে। মার্চ মাসের শেষের দিকে তাঁদের নামে

ডাকযোগে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হয়। ১লা এপ্রিল একটা বিরাট অনুষ্ঠান হবে, তাতে যোগদানের কথাই লেখা ছিল এই লিপিতে।—

"Tower of London—Admit Bearer and Friend to view annual ceremony of Washing the White Lions on Sunday, April 1, 1860. Admittance only at White Gate. It is particularly requested that no gratuities be given to wardens or attendants."

নির্দিষ্ট দিনে শত-সহস্র বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললেন। লণ্ডন-টাওয়ারের পথে পথে শুধু গাড়ি আর গাড়ি। কেউ আসছে, কেউ ফিরছে। সকলের মুখেই একই প্রশ্ন, "কোথায় হোয়াইট গেট্? কোথায় হোয়াইট লায়ন্?" কেউ বলতে পারে না—এসব কোথায়? সকলেই বিহ্বল, দিশেহারা। অনেক পরে অবশ্য এই বিরাট ধাপ্পাটা বুঝতে পেরেছিল সকলেই, দিনটা যে ছিল ১লা এপ্রিল।

অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে ১লা এপ্রিলে বোকা বানানোর প্রথা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। অ্যাডিসন তাঁর স্পেক্‌টেটারে এবিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর এক গর্বিত প্রতিবেশী দশ বছরের মধ্যে একশ জনকে বোকা বানিয়েছিল। বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে এই লোকটার এই কারণেই একটা গভীর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, সে বাড়ীওয়ালীর প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে ভূতের বেগার খাটিয়েছিল। এমন কি, বাড়ীওয়ালীকেও সে নানাভাবে বোকা বানিয়েছিল।

এই সময় গ্রামবাসীদের বোকা বানানো হত নানা উদ্ভট উপায়ে। কাউকে পাঠান হত বইয়ের দোকান থেকে এক কপি ইভের ঠাকুরমার ইতিহাস কিনে আনতে। মুদির-দোকান থেকে এক পাঁইট পায়রার দুধ সংগ্রহ করতেও পাঠান হত কাউকে। মুরগীর দাঁত

কোথায় পাওয়া যায় তারও সন্ধান নিতে ছুটতে হত লোককে। কাউকে আবার পাঠান হত মুচির কাছ থেকে একটু চামড়ার তেল সংগ্রহ করতে। এইসব কাজে যথেষ্ট হয়রানিই যে হত তা নয়, ক্ষেত্রবিশেষে দু-এক ঘা পিঠেও পড়ত তাদের।

অ্যাডিসন হয়ত এই প্রথার সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু সুইফ্‌ট নিজেই একবার "এপ্রিল ফুল" বানাবার জন্যে বেশ একটা ফন্দি এঁটেছিলেন। ডক্‌টর আবুর্থনাট্‌, লেডি মাশাম এবং সুইফ্‌ট এই তিনজন মিলে ৩১শে মার্চ সন্ধ্যায় একটা উদ্ভট পরিকল্পনা করেন। মতলবটা ছিল এই—গৃহ-ভৃত্যের সাহায্যে তাঁরা এই সংবাদ প্রচার করবেন যে, নোব্‌ল নামে যে ব্যক্তির কয়েকদিন পূর্বে ফাঁসি হয়েছিল সে আবার বেঁচে উঠেছে, আর এই লোকটাকে দেখতে পাওয়া যাবে হলবর্ণের "ব্ল্যাক সোয়ান" পান্থশালাতে। লোক ঠকাবার এই উদ্ভট ফন্দিটা ভালই ছিল, কিন্তু সুইফ্‌টের সহকর্মীদের দোষে তাঁর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল।

স্কটল্যাণ্ডবাসীরা কৌতুকপ্রিয়। শতাব্দীকাল পূর্বেও একটি বিচিত্র প্রথা ছিল এদেশে। একে বলা হত "Hunting the gowk।" 'গোকে'র আসল মানে কোকিল। কিন্তু 'বোকা' অর্থেই কথাটি ব্যবহৃত হত। আর ১লা এপ্রিলই নানাভাবে নানা কৌতুককর ঘটনার মধ্য দিয়ে লোককে বোকা বানানো হত। কোনও এক সরলপ্রকৃতির লোককে ধরে তারা পাঠাতো দু-মাইল দূরের কোন এক ব্যক্তির কাছে একটা চিঠি দিয়ে। চিঠিতে লেখা থাকতো,

"This is the first day of April,
Hunt the gowk another mile."

এই চিঠি নিয়ে সে যখন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হত, সে তখন এক মুখ হেসে বলত, এ চিঠি তো তার নয়, অন্য লোকের। বেচারা আবার সেই অন্য ব্যক্তির খোঁজে মাইল দুয়েক হেঁটে যেত। সেও আবার অন্য লোকের নাম-ঠিকানা দিয়ে তাকে মাইল দুয়েক দূরে

খোঁজ করতে পাঠিয়ে দিত। এমনি করে এই সাদাসিধে মানুষটিকে হয়রানি করা হত। পরে অবশ্য সে বুঝতে পারত এই উদ্ভট রসিকতার কারণ, কিন্তু তখন তো তার হয়রানি ও হাঁটাহাঁটির দুর্ভোগ শেষ হয়ে গেছে।

ফ্রান্সের একটি কৌতুককর কাহিনী এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক মহিলা তার এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে একটা ঘড়ি নিয়ে চলে যায়। এটা চুরি নয়, ১লা এপ্রিলের রসিকতা। আর রসিকতা করেই সে পুলিশকে ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে বলে জানিয়ে দেয়। চোরের নাম আর ঠিকানা জানতে পুলিশের দেরী হল না। পুলিশ যখন তাকেই চোর বলে ধরতে গেল, তখন পুলিশকেই সে বলল "এপ্রিল ফুল"। ব্যাপারটা গড়ালো কোর্ট পর্যন্ত। ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করে তাকেই চোর বলে সাজা দিলেন। তিনি বললেন, "ঘড়ি চুরির অপরাধে তোমাকে "এপ্রিল ফুল" বলে জেল দেওয়া হল, আগামী ১লা এপ্রিল পর্যন্ত তোমাকে "এপ্রিল ফুল" হিসেবেই জেলে থাকতে হবে।"

পয়লা এপ্রিলের সুযোগ নিয়ে লরেইনের ডিউক ফ্রান্সিস ও তাঁর স্ত্রী কেমন করে ন্যানটিস বন্দীশালা থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তারও একটি কৌতুককর কাহিনী আছে। সেদিন ছিল ১লা এপ্রিল, অল ফুলস্ ডে। কৃষকের পোশাক পরে তাঁরা প্রহরীদের ঠকিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন। তাঁদের এই ছদ্মবেশ কয়েকজন লোকের চোখে ধরা পড়ে, তারা ছুটে এসে প্রহরীদের সতর্ক করে দিয়ে যায়। প্রহরীরা কিন্তু ভাবে—আজ তো ১লা এপ্রিল, ওরা নিশ্চয়ই রসিকতা করছে। তাই প্রহরীরা চিৎকার করে তাদেরই উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, "এপ্রিল ফুল"। এই সুযোগে দুজন বন্দীই সরে পড়েন।

এলিজা লুইস নামে এক তরুণীর জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে এক প্রেমাকাঙ্ক্ষী যুবক। লুইস তাকে চায় না, কিন্তু সে তো লুইসকে চায়। কাজেই পথে ঘাটে চলে বিরতিহীন অনুসরণ।

বান্ধবীকে রক্ষা করবার জন্যে লুইসেরই এক বন্ধু চিঠি মারফত যুবকটিকে লুইসের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। নির্দিষ্ট দিনে বুকভরা আশা নিয়ে যুবকটি দেখা করতে আসে তার ঈপ্সিতার কাছে। সেদিন কি রকম অভ্যর্থনা যুবকের ভাগ্যে জুটেছিল তা রসিকজন মাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন।

এবার আমাদের দেশের কথাই বলি। এখানে এপ্রিলী রসিকতার ব্যাপক প্রচলন নেই বটে, কিন্তু অত্যুৎসাহী রসিকেরা মাঝে মাঝে বেশ কৌতুক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে থাকে। সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন বেজে ওঠে, আসে চাঞ্চল্যকর খবর, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা যায় বেশ কিছু খবর একেবারে ভুয়ো। হৃদপিণ্ড কাঁপিয়ে দমকল রাস্তায় ছোটে আগুন নেভাতে। কিন্তু কোথায় আগুন? সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা এদেরও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। কিন্তু সভা-সমিতি বসবে কি করে? ব্যাপারটা সবটাই যে ভুয়ো। অন্তরঙ্গদের সঙ্গেও তো কত রকমের রঙ্গ-রসিকতা চলে এইদিন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে খুব সহজেই এপ্রিল ফুল করা যেত। একবার রবীন্দ্রনাথ গোঁফ দাড়ি পরে পার্শীর পোশাকে সেজে তাঁকে বেশ ঠকিয়েছিলেন।

কিন্তু এই বিচিত্র প্রথার উৎপত্তি হল কি করে? কোন্ সুদূর অতীতে মানুষকে বোকা বানানোর এই রীতি প্রচলিত হয়েছিল? এ সম্বন্ধে অবশ্য নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। এই প্রথার উৎস সন্ধান করতে পণ্ডিতেরা তো হিমসিম খেয়েছেন। কেউ খুঁজেছেন যীশুখৃষ্টের বিচার-প্রহসনের মধ্যেই এর উৎস; কেউ পেয়েছেন রোমের Saturnalia উৎসবের মধ্যে এর উৎপত্তির ইঙ্গিত। এশিয়াটিক রিসার্চেস্ গ্রন্থে কর্ণেল পীয়ার্স লিখেছেন, এপ্রিল ফুলের সঙ্গে হিন্দুস্থানের হোলী উৎসবের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে।

এই বিচিত্র প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে রোমের "Cerealia" উৎসবেরও

অনেকে উল্লেখ করেন। জুপিটারের রূপবতী কন্যা প্রসারপিনা একদিন নন্দন-কাননে ফুল তুলছিল। এমন সময় হঠাৎ প্লুটো তাকে নিয়ে পাতালপুরীতে পালায়। প্রসারপিনার মা তার কন্যার ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পায়। সেই প্রতিধ্বনি অনুসরণ করে সে ছোটে। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

অনেকে বলেন, এই প্রথাটির উদ্ভব হয়েছে ফ্রান্স থেকে। ১লা এপ্রিল যখন নববর্ষের প্রথম দিন ছিল তখন অভিবাদন ও উপহার বিনিময় চলত ঐদিন। ১৫৬৪ সালে রাজার আদেশে ১লা এপ্রিলের পরিবর্তে জানুয়ারীর প্রথম দিনে নববর্ষ হয়। তারিখ পরিবর্তন হল বটে, কিন্তু কেউ কেউ ভুল করে ১লা এপ্রিলকেই নববর্ষের প্রথম দিন বলে মনে করত। যারা এরূপ ভুল করত তাদের ভাগ্যে জুটত উপহাস, নানা প্রকারের রসিকতা আর নকল উপহার। এই থেকেই নাকি ১লা এপ্রিলের উৎপত্তি। এইরূপ বোকা লোকদের বলা হত Un Poison d' Avril বা এপ্রিল মৎস্য। এরা ছোট ছোট মাছের মতই টোপ গিলে সহজেই বোকা বনে যেত বলে এদের এইরূপ বলা হত।

এখানে ১লা এপ্রিলের সম্বন্ধে দিগদর্শন হিসেবে কয়েকটি কথাই বলা হল, কিন্তু সত্যি কথা এই, এর উৎপত্তির প্রামাণিক তথ্য আজও পাওয়া যায়নি। একটি পুরাতন ছড়ায় এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

"The first of April, some do say
Is set apart for 'All fools' day,
But why the people call it so
Nor I nor they themselves do know".

পাগানিনির কবর

ভিয়েনা শহরের রঙ্গমঞ্চে এক যন্ত্র-শিল্পী অবতীর্ণ হলেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। ভায়োলিনের তারে প্রথম সুরের ঝঙ্কার তোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল। তারপর একের পর এক সুরের মায়াজাল রচনা করে তিনি বিমোহিত করলেন ভিয়েনার রসগ্রাহী শ্রোতাদের। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনল তারা কনসার্টের অনবদ্য সুর-ঝঙ্কার। দিনের পর দিন উন্মাদনার সৃষ্টি হল ভিয়েনায়। এই প্রতিভাধর শিল্পীকে তারা পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করল।

এই সুর-সাধকের নাম নিকোলো পাগানিনি। উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভায়োলিন-শিল্পী, সঙ্গীত-জগতের এক যুগান্তকারী প্রতিভা। জন্ম ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে জেনোয়া শহরে।

পাগানিনির খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল ভিয়েনায়। শহরের বহু বিপণিতে শোভা পেল তাঁর নানা আকারের প্রতিকৃতি। নস্যির কৌটোর ঢাকার ওপর অঙ্কিত হল তাঁর নাম। ছোট ছোট বেহালার আকারে তৈরী হল রুটি, নানাপ্রকারের খাবার জিনিসের ওপর ছাপ পড়ল তাঁর নামের। রেস্টুরেন্টের খাদ্য-তালিকায় উৎকৃষ্ট সব খাদ্যের নামকরণ করা হল তাঁর নামেই। গুণগ্রাহী মহিলারা কেশবিন্যাস করতে লাগলেন পাগানিনির স্টাইল অনুকরণ করে। টুপি, টাই, রিবন, বোতাম, রুমাল, জুতো, পিন, পাইপ এইসব নিত্যব্যবহার্য জিনিস নামাঙ্কিত হল পাগানিনির নামেই। এমন কি, কেউ যদি অনবদ্য স্টাইলে বিলিয়ার্ড খেলত তার সেই খেলার স্টাইলকেও বলা হত আ লা পাগানিনি—অর্থাৎ পাগানিনি স্টাইল। পোশাক-পরিচ্ছদের নামকরণও হল পাগানিনির নামে।

শুধু ভিয়েনায় নয়, সারা ইউরোপে তিনি বিপুল খ্যাতি ও

জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৮০৫ থেকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইটালী, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ সুরের ঝঙ্কারে প্লাবিত করেন, উন্মাদনার সৃষ্টি করেন বহু স্থানে।

কেউ ছুটেছে তাঁর পিছু পিছু বেহালার একটু ছিন্ন তার সংগ্রহ করতে, কেউ বা লজ্জার মাথা খেয়েই ভিক্ষা চেয়েছে তাঁর কাছে একটা চুম্বন। রাজকুমারী এলিস তো তাঁর প্রেম-গীতি শুনে আনন্দের আতিশয্যে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। তাঁর বেহালা বাজানোর নিজস্ব যে টেকনিক ও স্টাইল ছিল তার রহস্য জানবার জন্য একাধিক সঙ্গীতজ্ঞ দীর্ঘদিন তার পিছনে ঘুরেছে, অর্থব্যয় করেছে। এমন কি দুঃস্থ সঙ্গীতরসিকেরা তাঁর কনসার্ট শোনার জন্য তাদের পোশাক পর্যন্তও বাঁধা দিয়ে টিকেট কিনেছে।

*   *   *   *

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের কথা। ইংল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ তাঁর কনসার্ট শোনবার জন্য তাঁকে তাঁর প্রাসাদে নিমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তার দক্ষিণা ১০০ পাউণ্ডের পরিবর্তে ৫০ পাউণ্ড দিতে চাইলেন। পাগানিনির আত্মসম্মানে আঘাত লাগল, তিনি সদর্পে রাজাকে বললেন, "মহামান্য রাজা, আমি যখন শহরের কোন প্রেক্ষাগৃহে কনসার্ট শোনাব, আপনি সেখানে গিয়েই শুনবেন, তাহলে সস্তাতেই আপনার শোনা হবে।"

পাগানানির জীবন বিচিত্র। কিন্তু সবচেয়ে বিচিত্র, সবচেয়ে বিস্ময়কর হল তাঁর সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী ও কিংবদন্তীর সৃষ্টি। বহুলোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, একটা অতি-প্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী বলেই তাঁর পক্ষে এমন অপূর্ব সুর সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তাদের বিশ্বাস, তাঁর সঙ্গে শয়তানের মিতালি ছিল, শয়তানের কাছ থেকেই সব মন্ত্র, সব প্রেরণাই লাভ করেন তিনি। পাগানিনির চেহারার মধ্যেও একটা ডেভিলের রূপ তারা

যেন সন্ধান পেয়েছিল। তাঁর বিষণ্ণ মলিন মুখ, শীর্ণ শরীর, কঙ্কালসার আঙুল, অগ্নিগর্ভ কোটরাগত চোখ আর আস্কন্ধবিস্তৃত কালো চুল অনেকের মনেই এই ধারণাকে দৃঢ় করেছিল। আশ্চর্য, পাগানিনি নিজে এই মতবাদের কোনদিন প্রতিবাদ করেননি। বরং নিজের সুবিধার জন্য বহুবার প্রকাশ্যেই এর প্রশ্রয় দিয়েছেন।

পাগানিনির মৃত্যু হয় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে উইল করে যান তাতে তিনি তাঁর প্রিয় বেহালাটিকে দান করে যান জেনোয়া নগরীকে। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যারা এসেছিল, তাদের অনেকেই সেদিন তাঁর ভ্রূকুটি-কুটিল চোখ আর বিকৃতমুখ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিল। মহিলাদের মধ্যে কেউ বা ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল, কেউ বা সংজ্ঞা হারিয়েছিল।

সে যাই হোক, সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিল মৃতদেহের সৎকার নিয়ে। যেহেতু পাগানিনি শয়তানের সংস্পর্শে এসেছিল বলে তাঁর দুর্নাম রটেছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে কোন ধর্মানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করেন-নি, সেইজন্য নিস্-এর আর্কবিশপ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি খৃষ্টধর্মমতে মৃতদেহকে সমাধিস্থ করতে আদেশ দিলেন না। বরং গির্জা থেকে যে ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করেছিল তাও তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়ে দিলেন।

বিপদে পড়ল পাগানিনির পুত্র অ্যাকিলিনো আর তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা। আর্কবিশপের কাছে ধর্ণা দিয়ে কোন ফল হল না। পাগানিনির শত্রুরা বললে, গভীর রাত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে মৃতদেহকে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হোক। চুকে যাক সব ঝঞ্ঝাট। এক গির্জার পাদ্রী বলল, পাগানিনির রোগশয্যার পার্শ্বে এমন কোন জিনিস সে দেখেনি যা প্রমাণ করতে পারে যে তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক, বরং কয়েকটা অশ্লীল ছবিই তাঁর চোখে পড়েছে সেখানে।

পাগানিনির শব যাতে জেনোয়ায় কবরস্থ করা যায় তার জন্য অ্যাকিলিনো এই শহরের মেট্রোপলিটান ট্যাডিনি এবং রাজা চার্লস এলবার্টের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু এখানেও তেমন কিছু সুফল

পাওয়া গেল না। জেনোয়ার প্রটেষ্টান্টরা সোজাসুজি বলে দিল জীবিতকালে যে লোকের সঙ্গে শয়তানের যোগ ছিল এমন লোকের সমাধির স্থান জেনোয়ায় নেই।

এরপর ১৮৪১ সালের অক্টোবর মাসে একিলিনো এক উকিল সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হল রোমে পোপ ষোড়শ গ্রেগরীর কাছে দরবার করতে। তিনি পাগানিনির ধর্মমত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য এক কমিশন বসিয়ে দিলেন। কিন্তু কাজ কিছুই হল না, কেবল স্তূপীকৃত হল সাক্ষীদের জবানবন্দী।

এমনি করে কেটে গেল চার বছর, কিন্তু এই ক বছর কোথায় ছিল পাগানিনির মৃতদেহ, কোথায় ছিল এই প্রখ্যাত শিল্পীর শবাধার? সেই বিস্ময়কর কাহিনীই বলছি এখানে।

প্রথমে পাগানিনির মৃতদেহকে রাখা হয়েছিল তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু মৃতদেহের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাসিন্দারা আতঙ্কিত হল। হঠাৎ ঘরের বাতি জ্বলে উঠল, আবার নিভেও গেল। চাপা আর্তনাদও শুনতে পেল তারা। গভীর রাতে গানের সুর ভেসে আসতে লাগল ঘরের ভেতর থেকে।

তাই একদিন রাতের অন্ধকারে কাউন্টের বাড়ি থেকে শবাধারকে স্থানান্তরিত করা হল অতি সঙ্গোপনে এক হাসপাতালের নির্জন কোণে, কিন্তু এখানেও অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে লাগল। রাস্তার লোকেরা ভীতিগ্রস্ত হল। তারা অভিযোগ করল, রাতের পর রাত এই নির্জন জায়গাটা ডাইনীদের আড্ডায় পরিণত হয়েছে।

কাজেই এখান থেকেও সরিয়ে নিতে হল মৃতদেহকে। কিন্তু কোথায়? কোন নিভৃত স্থানে? বিরাট একটা চৌবাচ্চার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হল শবাধারকে যেখানে ফেলে দেওয়া হত যতসব অলিভ গাছের ডালপালা।

এই স্থান থেকেও পাগানিনির বন্ধু মৃতদেহকে স্থানান্তরিত করেন তাঁর এষ্টেটের কোন এক নিরালা জায়গায় বা অন্য কোন স্থানে। কেউ

বলে শবাধারকে রাখা হয়েছিল সমুদ্রের ধারে এবং সমুদ্রতীরে রাখার ফলে সমুদ্র হয়েছিল বিক্ষুব্ধ। ঝড়ও উঠেছিল সমুদ্রে, জলোচ্ছ্বাসও দেখা দিয়েছিল সমুদ্রতীরে।

এরপর এই রহস্যময় মৃতদেহকে কবরস্থ করা হয় ভূমধ্যসাগরের কোন এক দ্বীপে। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে যখন শবাধার নিয়ে জেনেওয়ার পোতাশ্রয়ে নামবার অনুমতি দেওয়া হল না, তখন সে তাড়াতাড়ি সেণ্ট ফেরকোল দ্বীপে মৃতদেহকে কবর দিয়ে চলে যায়।

এই দ্বীপ থেকেও স্থানান্তরিত হয় শবাধার কোন এক রহস্যময় নৌকার সাহায্যে। যেখানে কবরস্থ করা হল সেই স্থানের নাম 'পেগানিনি হোল' নামে বর্ণিত হয়। মপাসাঁ এই জায়গার কিছু বিবরণ লিখে গেছেন।

এরপর মেরি মেডেলিন নৌকায় চড়ে পাগানিনির কফিন এসে পৌঁছল তাঁর জন্মভূমিতে, তাঁর পারিবারিক বাসভবন পোলসিভেরাতে।

কিন্তু নিজের বাড়িতেও পাগানিনির মৃতদেহ পেল না আশ্রয়, পেল না শান্তি। অদৃষ্টের কি পরিহাস! সমস্যা দেখা দিল এখানেও। বাড়ির আশেপাশের লোকেরা অস্বস্তি বোধ করল, রাত্রে তারা শুনতে পেল কান্নার করুণ সুর। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তারা নানা অভিযোগ জানাল।

শেষে পার্মার এক সম্ভ্রান্ত মহিলা রাজী হলেন এই মৃতদেহকে আশ্রয় দিতে তাঁর এক ভিলাতে। এখানের এক পার্কে সমাধিস্থ হল মৃতদেহ। পিতৃভক্ত একিলিনো এই ভিলাতেই আশ্রয় নিল। প্রথমের দিকে মৃতের আত্মীয় বন্ধুরা আসতো এখানে। কিছু পরে কেউ আর এল না এই ভিলাতে। একিলিনো একাই রইল পিতার কবর জেগে নিয়ে।

এমনি করে কয়েক বছর কেটে গেল। একিলিনোর কিন্তু চেষ্টার

বিরতি নেই। পিতার আত্মার চিরশান্তির জন্য তিনি এখনও পোপের কাছে একটু পবিত্রভূমি পাবার আশায় আবেদন-নিবেদন করে চলেছেন। ১৮৭৫ সালে পোপ সদয় হলেন, পার্মার এক সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহকে কবরস্থ করবার অনুমতি দিলেন তিনি। এত বছর পরে পাগানিনির দুর্নাম ঘুচল। খৃষ্টধর্মমতে তাঁর সৎকার হল।

আরও কুড়ি বছর কেটে গেল। এল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ। আবার পাগানিনির শান্তি বিঘ্নিত হল। বহু বাদানুবাদের পর পার্মার পৌরসভা সিদ্ধান্ত করল পার্মা থেকে সমাধিক্ষেত্র স্থানান্তরিত করতে হবে পেলার্মোর একস্থানে। কন্ট্রাক্টর, মিস্ত্রি, মজুর কবর খোঁড়ার কাজে নিযুক্ত হল। পার্মার নবনির্মিত সমাধিক্ষেত্রে আনা হল পাগানিনির শবাধার। রমণীয় পরিবেশের মধ্যে তাঁর জন্য নির্মিত হল গ্রানাইট পাথরের এক উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতিফলকে ক্ষোদিত হল—

"নিকোলো পাগানিনি যিনি ভায়োলিন থেকে স্বর্গীয় সঙ্গীত বের করেছিলেন।"

ওরা বেঁচে আছে

কৃতজ্ঞ মানুষ ওদের কবরের ওপর স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেছে, খোদাই করেছে তাদের মূর্তি, উৎকীর্ণ করেছে বহু লিপি। সাহিত্যের দরবারেও স্থায়ী আসন লাভ করেছে ওরা।

ইতিহাসের পাতায় অনেক জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু ওদের জীবন-কাহিনী বিচিত্রতর। প্লিনি রাজা লিসিমেকাসের এক প্রিয় কুকুরের কথা লিখেছেন। প্রভুর মৃত্যুর পর এই বিশ্বস্ত কুকুরটি তারই চিতাকুণ্ডের ওপর লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করেছিল। রোম সম্রাট নিরোকে হত্যা করতে যে ষড়যন্ত্রকারী অংশ গ্রহণ করেছিল তারও একটি প্রিয় কুকুর ছিল। লোকটাকে যখন ফাঁসিমঞ্চে আনা হল কুকুরটাও ছুটে এল তার কাছে এবং তার মৃতদেহকে যখন টাইবার নদীর জলে ফেলে দেওয়া হল কুকুরটাও তারই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর জলে।

প্রায় আড়াই একর জমির ওপর পারী নগরীর পাশে আছে এক সুন্দর সমাধিক্ষেত্র। এর সুদৃশ্য প্রবেশদ্বারে বড় বড় হরফে লেখা আছে Cimetiere des Chiens. এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে প্রায় দশ হাজারের ওপর মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু, বহু লোকের প্রিয় পোসা কুকুর। শুধু কুকুর নয়, বিড়াল, মোরগ, বাঁদর, ঘোড়া ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে এই সমাধিক্ষেত্রে। কুকুরদের সমাধি-স্তম্ভে বহু আবেগ, অনুরাগের প্রেম-স্নিগ্ধ লিপি খোদাই করা আছে। একটি সমাধি-স্তম্ভে লেখা আছে, 'প্রিয় বন্ধু, আমরা এখন খুব ছোট, কিন্তু যখন বড় হব তখন তোমাদের জন্য কাঁদব।" আর একটিতে খোদিত রয়েছে, "আমার প্রিয়তম টিটো, আমার বন্ধু ও প্রেমিকেরা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কিন্তু তুমিই আমার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু।"

অন্য কয়েকটি স্থানে প্যাসকেলের সেই অমর উক্তি উৎকীর্ণ হয়েছে—"যতই আমি মানুষকে দেখি, ততই আমি আমার কুকুরকে ভালবাসি।" এই সমাধিক্ষেত্রের গেটের মুখেই রয়েছে এক কুকুরের সুদৃশ্য স্মৃতিস্তম্ভ। এই কুকুরের নাম ব্যারী। ব্যারীর কথাই বলছি এখানে।

পারীর সমাধিক্ষেত্রে ব্যারী

তুষারমৌলী আল্পস্। শীতাধিক্যে, ঝড়ঝঞ্ঝায়, তুষারাঘাতে কত পথিক বিপন্ন হয়, পথ হারায়, মৃত্যু বরণ করে। বরফ-স্তূপের নীচে চাপা পড়ে জীবনান্ত ঘটে বহু লোকের। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধারের কাজে সাহায্য করে সেণ্ট বার্ণার্ড মঠের বলিষ্ঠ সুশিক্ষিত কুকুরের দল্। এই আট হাজার ফুট উঁচু আলপাইন মঠেরই এক কুকুর ব্যারী। বরফে চাপা পড়ে বা দারুণ শীতে পথিক যখন বিপন্ন হত, মুমূর্ষু হত, তখন এই ব্যারী ছুটতো তাদের কাছে। তার লোমশ শরীর তাদের গায়ে লাগিয়ে শীতাধিক্য থেকে তাদের রক্ষা করত, তার মসৃণ গরম জিভ্ দিয়ে চেটে চেটে তাদের হিমশীতল হাত মুখ গরম করে দিত, আর তার গলায় ঝুলানো মদ আর খাদ্য দিত তাদের খেতে। তারপর এই বিপন্ন ব্যক্তিদের টুপি মুখে তুলে নিয়ে ছুটে আসত সেই মঠে জরুরী সাহায্যের প্রয়োজন জানাতে, অবিলম্বে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করাতে।

এমনি করে সাত-আট বছর ধরে ৪০ জন বিপন্ন পথিককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছে এই ব্যারী। কিন্তু এরপর ঘটল এক নিদারুণ ঘটনা।

ডিসেম্বর মাসের হাড়-কাঁপানো শীতে এক পথিক চাপা পড়ল বরফের নীচে। ছুটে এল ব্যারী তাকে উদ্ধার করতে। চীৎকার করতে করতে জানালো তার উপস্থিতি। উদ্ধার তো করতেই হবে এই মৃত্যুপথযাত্রীকে, তাই টেনে তুলতে গেল তাকে সেই বরফের

স্তূপের ভেতর থেকে। ব্যারীকে দেখেই লোকটা কিন্তু ভীষণ আতঙ্কিত হল, ভাবলো কুকুরটা বোধ হয় কামড়াতেই আসছে তাকে। এই ভেবে তার কাছে যে ছোট একটা লোহার ডাণ্ডা ছিল তাই দিয়েই সে সজোরে আঘাত করল ব্যারীর মাথায়। মারাত্মকভাবে আহত হল ব্যারী, রক্ত ঝরে পড়ল তার সারা অঙ্গ থেকে, কিন্তু তা সত্বেও বহু কষ্টে দেহটাকে টেনে নিয়ে সে পৌঁছল এসে মঠে জানাতে এই বিপন্ন পথিকের কথা। ব্যারী তার কর্তব্য শেষ করেই ঢলে পড়লো সেইখানেই।

ত্রাণকারীর দল ছুটলো বিপন্ন লোকটাকে উদ্ধার করতে। উদ্ধার তাকে করল বটে, কিন্তু ব্যারীকে জীবন দিতে হল সেই পথিকের ভুলের জন্যে।

প্যারীর সেই সুদৃশ্য সমাধিক্ষেত্রে ব্যারীকে কবর দেওয়া হল। ধূসর রং-এর পাথরের এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হল সেখানে। এই স্মৃতিস্তম্ভে ব্যারীর পিঠে রয়েছে এক বালিকা যাকে সে উদ্ধার করেছিল আল্পস পর্বতের বরফ থেকে। এই সমাধিস্তম্ভের নীচে এক ক্ষুদ্র লিপিতে লেখা আছে—“সে চল্লিশটি জীবন রক্ষা করেছিল, ৪১তম ব্যক্তির হাতে তার মৃত্যু হয়।”

লণ্ডন নগরীর বিখ্যাত কেনসিংটন গার্ডেনসে কুকুরের একটি সমাধিক্ষেত্র আছে। চার শতের বেশী বিভিন্ন জাতের কুকুর সমাধিস্থ হয়েছে এই নির্জন স্থানে। কেম্ব্রিজের এক ডাচেসের চেষ্টার ফলেই এই সমাধিক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে এখানে।

একদিন ডাচেস তাঁর “ভিক্টোরিয়ায়” চড়ে এই পার্কে বেড়াচ্ছেন। গাড়ির পাশে পাশেই চলেছে তাঁর প্রিয় কুকুরটি। হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে তাঁরই গাড়ির চাকার নীচে পড়ে প্রাণ হারাল তাঁর প্রিয় কুকুর। সে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যেখানে তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেইখানে গড়ে উঠলো এই সমাধিক্ষেত্র। এই সমাধিক্ষেত্রে সারমেয়ভক্ত মানুষ বহু বিচিত্র লিপি খোদাই করেছে ছোট ছোট

স্মৃতিফলকে। একটি সমাধিস্তম্ভে লেখা আছে "প্রিয়তম ডলি, আমার সূর্যরশ্মি, আমার সান্ত্বনা, আমার আনন্দ।"

সেপের কথা

ফোর্ট বেন্‌টন স্টেশন, মনটানা, আমেরিকা। ট্রেন আসে, ট্রেন যায়। ১৯৩৬ সালের অগস্ট মাসেও একদিন ট্রেন এল। এই ট্রেনেই পাঠান হল এক মানুষের শবাধার কোন এক স্থানে কবর দেওয়ার জন্য। এই কফিনের মধ্যে ছিল এক কুকুরের প্রিয় প্রভুর মৃতদেহ। এই কুকুরের নাম সেপ্।

ট্রেন ছাড়ল, কিন্তু ট্রেনের পিছু পিছু ছুটলো সেপ্। যেতে চাইল সে তার প্রভুর সঙ্গে। ট্রেন যখন অদৃশ্য হল তখন সে লেজ নীচু করে মাথা হেঁট করে ফিরে এল সেই স্টেশনেই। আশ্রয় নিল প্ল্যাটফরমের তলায় একটা গর্তের ভেতর। তার নিশ্চিত বিশ্বাস তার প্রভু ফিরে আসবেই, তার জন্য সে অপেক্ষা করবে এই স্টেশনেই।

দিনের পর দিন ট্রেন আসে, ট্রেন যায়। ট্রেন থামলেই সে ছুটে যায় যাত্রীদের কাছে, সজাগ, সতৃষ্ণ চোখ দুটি মেলে তাদের উপর, হাতে পায়ে নাক দিয়ে গন্ধ শোঁকে, কি যেন বলতে চায়, তার প্রভুর সন্ধান করে চারিদিকে। দিনের পর দিন ছুটে যায় চলন্ত ট্রেনের পিছু পিছু লাইনের ওপর দিয়ে। তারপর দৃষ্টির অন্তরালে ট্রেন চলে গেলে আশ্রয় নেয় এসে সেই প্ল্যাটফর্মের নীচে। সজল চোখে গার্ডের দিকে তাকায়, মনের কথাটি যেন তাকে জানায়, 'আমার প্রভু কি এই ট্রেনেই আসছে?'

এক বছরের মধ্যেই এই প্রভুহারা সেপের কথা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। শত শত লোক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসে তাকে দেখতে। অনুসন্ধিৎসু রেল যাত্রীরা জানালার ফাঁক দিয়ে সন্ধান করে সেপের। দূরপাল্লার যাত্রীরা ফোর্ট বেন্‌টন স্টেশনে নেমে

সেপকে দেখে যায়। সংবাদপত্রে সেপের ছবি আর বিবরণ ফলাও করে প্রকাশিত হতে থাকে।

সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেপকে আশ্রয় দেবার জন্য, তার দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য দেশ দেশান্তর থেকে আসে বহু লোকের অনুরোধ। কিন্তু সেপ স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে অন্য কোথায় গেল না। সে তার প্রভুর আসার অপেক্ষায় এইখানেই থেকে গেল।

সেপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। রাশি রাশি চিঠিপত্র আসতে থাকে দূরদূরান্ত থেকে। কেউ পাঠায় তার সাহায্যের জন্য টাকা, কেউ চেয়ে পাঠায় তার ছবি, কেউ বা উপদেশ দেয় কেমন করে তার যত্ন নিতে হবে। এত চিঠিপত্র আসতে থাকে যে স্টেশনের এজেন্টের পক্ষে সব পড়াই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই রেলবোর্ডের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত করলেন সেপের জন্য এক সেক্রেটারী। ইতিহাসে সেপই প্রথম কুকুর যার জন্য একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করতে হয়েছিল।

এমনি করে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচটি বছর কেটে গেল। কিন্তু সেপের প্রভু-সন্ধানের কোন বিরাম নেই, বিরতি নেই। গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা, তুষারপাত যাই হোক না কেন, ট্রেন এলেই সেপের সেই একটাই কাজ—তার প্রভুকে খুঁজে বেড়ান।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪২ সাল। কনকনে শীত, বরফ পড়েছে বেন্‌টন্ স্টেশনের চারিদিকে, স্টেশনের চারিধার হয়েছে পিচ্ছিল, রেল লাইন আরো বেশী। এই সময়েও সেপ্‌কে দেখা গেল ছুটো রেল লাইনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে তার ছুটে আসা ইন্‌জিন্‌টার দিকে। এমনি করেই তো দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আসছে সে, এ তো আর কোন নতুন কাজ নয়। এমনি সময় চোখের নিমেষে ট্রেন ঢুকল স্টেশনে। সেপ্ মাথা উঁচু করে ছুটে আসছে প্ল্যাটফরমের দিকে কিন্তু হঠাৎ পা গেল তার পিছলিয়ে।

নিজেকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করল বটে কিন্তু একচুলের জন্য বাঁচাতে পারল না নিজেকে। কাটা পড়ল ট্রেনের নীচে।

সেপের মৃত্যুসংবাদ বিদ্যুৎগতিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিষাদের ছায়া নামল স্টেশনে। দুদিন পরে সেপকে সমাধিস্থ করা হল। সেপের মৃত্যুর জন্য দোকান বাজার সেদিন বন্ধ হল। স্কুল ছুটি হয়ে গেল। রান্নাবান্না ছেড়ে গৃহিণীরা ছুটে এলো সেপের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে। সেপের কবরে পাঠ করলেন ধর্মযাজক—

"এই স্বার্থপর জগতে একমাত্র স্বার্থহীন বন্ধু হচ্ছে কুকুর, যে তার প্রভুকে কখনও পরিত্যাগ করে না, যে কখনও অকৃতজ্ঞ হয় না বা বিশ্বাসঘাতকতা করে না।"

অশ্রুসজল চোখে সেপ্‌কে সমাধিস্থ করা হল। তার কবরের ওপর কাঠের এক মূর্তি স্থাপিত হল। ট্রেনযাত্রীরা যখন দেখে এই স্মৃতিচিহ্ন তখন হয়ত ভাবে মৃত্যুর পর সেপ্‌ তার প্রিয় প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

গ্রেফ্রায়ার্স ববি

দশ ইঞ্চি উঁচু, দু ফুট লম্বা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মসৃণ চুল। এডিনবরা নগরীর কাছে এক ভেড়ার ফার্মে থাকে সে। ইঁদুর ও মুরগী তাড়ান ছিল তার কাজ। আশেপাশের ছেলেদের কাছে সে ছিল খুব প্রিয়। এই ছোট্ট কুকুরটির নাম ববি। এই ফার্মেই কাজ করত ওল্ড জক। জকের ছিল না কোন পরিবার। তার নিঃসঙ্গ জীবনে ববি ছিল তার প্রিয়তম সঙ্গী, তার নিত্য সহচর, অবিচ্ছেদ্য বন্ধু। যেখানেই জক, সেইখানেই ববি—হাটে, বাজারে, কর্মস্থানে, ভোজনালয়ে, শয্যাপার্শ্বে, সকালে সন্ধ্যায় রাত্রিতে। জক তাকে শেখাত নানা কৌশল; কেমন করে বসতে হয়, খাবার চাইতে হয়, গির্জায় গিয়ে চুপ করে থাকতে হয়।

জক ছিল খুব গরীব। শহরের এক প্রান্তে ঘর ভাড়া করে থাকত সে। একদিন জক প্রবল জ্বরে শয্যা নিল। সারারাত সে কাসল। উৎকণ্ঠিত ববি কাছ ছাড়ে না, বিছানার পাশেই থাকে। জিভ দিয়ে হাত চাটে, সারা রাত থাকে জেগে। সেই রাত্রেই জক মারা গেল। সকালে ববি আর তার প্রভুর ঘুম ভাঙাতে পারল না।

গ্রেফ্রায়ার্স কবরে জকের মৃতদেহ যখন নিয়ে যাওয়া হল ববিও চলল তার পিছু পিছু। কবরের পাশেই রাত কাটাল সে। পরের দিন কবরের তত্ত্বাবধায়ক কুকুরটাকে দিল তাড়িয়ে কিন্তু ববি আবার ফিরে এল সেখানে। এক কৃষক তাকে জোর করে নিয়ে গেল তার বাড়ি। তালাবন্ধ করেও রাখল, কিন্তু ববিকে আটকাতে পারবে কে? ঘরের মাটি খুঁড়ে পালিয়ে এল ববি সেই কবরে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে। সমাধি ক্ষেত্রে এসে ইঁদুর মেরে ববি কেয়ার-টেকারকে দেখাত তার কাজ। বেড়ালদের তাড়াত গোরস্থান থেকে।

কেয়ার-টেকার দেখল যে কুকুরটাকে দিয়ে ভাল কাজ হচ্ছে, তাই তাকে আর তাড়িয়ে দিল না সে। বরং সে তার সবিশেষ যত্ন নিল। ববির সে চুল ব্রাস করে দিত, স্নান করিয়ে দিত। এক রেস্টুরেন্টের মালিকও তাকে খাবার দিত খেতে। কবরের পাশে যে সব গরীব ছেলে-মেয়েরা বাস করত তারা ববিকে এত ভালবাসত যে সন্ধ্যার সময় জানালার কাছে ছোট ছোট বাতি জ্বালিয়ে তাকে 'গুড নাইট ববি' বলে সম্ভাষণ জানাত।

ববির কথা এখন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ববিকে তাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে সযত্নে পালন করতে চাইল। এক দুর্গের সৈনিকেরা এক দিন নিয়ে গেল তাকে ফোর্টে, কিন্তু রাত্রিবেলায় দুশো ফুট উঁচু পাহাড় টপকে পালিয়ে এল সে আহত হয়ে।

পুলিশের লোকেরা ভাবত ববি একটা ভবঘুরে রাস্তার কুকুর।

এর কোন লাইসেন্সও ছিল না, কাজেই সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল একদিন। ববির সব কাহিনী জানতে পেরে এডিনবরার প্রভোস্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই লাইসেন্স করিয়ে দিলেন ববির। আর কিনে দিলেন তার কলার।

বহু লোকের সমাগম হতে লাগল সেই কবরের কাছে ববিকে দেখবার জন্য, যে ববি তার প্রভুর কবর ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না তাকেই দেখার জন্য।

ববি এখন বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে তার প্রভুর কবরের কাছেই আছে, আর গির্জা ও সমাধিক্ষেত্রকে ইঁদুর ও বিড়ালের উৎপাত থেকে রক্ষা করছে। তারপর একদিন তার প্রভুর কবরের পাশেই দেহরক্ষা করল সে। ববির মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হল তার প্রভু জকের কবরের পাশেই।

এক সম্ভ্রান্ত মহিলার কানে গেল ববির বিচিত্র কথা। তাঁর মনে হল এই প্রভুভক্ত কুকুরের কথা কেউ যেন ভুলে না যায়। সকলের কাছেই যেন প্রচারিত হয় তার অপূর্ব প্রভুভক্তি। তাই তিনি এক ফোয়ারা তৈরী করিয়ে দিলেন এই সমাধিক্ষেত্রের গেটের বাইরে, এডিনবরার সব কুকুর যেন সেখানে গিয়ে ঠাণ্ডা জল খেতে পারে।

আর এই ফোয়ারার ওপর বসালেন ববির এক ব্রোঞ্জ মূর্তি—দেখলে মনে হয় যেন হুবহু ববিই বসে আছে এমন নিখুঁত এই মূর্তি। ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি আজও আছে, সেই ফোয়ারাও আছে। আর গেটের পাশে কেয়ার-টেকারের কুটিরে আজও রক্ষিত আছে ববির সেই কলার।

গ্রেফ্রায়ার্সের সমাধিক্ষেত্রে ববির যে স্মৃতিস্তম্ভ আছে তাতে লেখা হয়েছে এই লিপি :—

"A tribute to the affectionate fidelity of Greyfriars Bobby. In 1858 this faithful dog followed the remains

of his master to Greyfriars Churchyard and lingered near the spot until his death in 1872. With permission erected by the Baroness Burdett—Coutls."

স্মৃতি-মন্দির

সিমলার পাহাড়ী অঞ্চলের রায়পুর থেকে এগার মাইল দূরে জগাসর গ্রামে বাস করত এক বানজার নায়েক। সে এক মারওয়াড়ী মহাজনের কাছে ধার করেছিল কিছু টাকা। একদিন এই মারওয়াড়ী টাকার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। টাকা তার চাইই— কোন অজুহাতই সেদিন সে শুনতে রাজী হয়নি। অগত্যা নায়েক বলল, "বেশ, এই নাও আমার সোনার হার, আর এই রইল আমার বিশ্বস্ত কুকুর। এদের আমি আজ তোমার কাছে জামিন রেখে যাচ্ছি। গ্রাম থেকে টাকা নিয়ে এসে কাল তোমার ধার শোধ করব আর আমার হার ও কুকুরটাকে নিয়ে যাব।"

সেদিন রাত্রে মারওয়াড়ী মহাজনের বাড়িতে পড়ল এক চোরের দল। সুকৌশলে ঘরে ঢুকে মূল্যবান সব জিনিসপত্র আর তার সঙ্গে সেই হারটাও তারা হস্তগত করল। কিন্তু এই সব জিনিস নিয়ে পালাবার আগেই কুকুরটা বিকট চীৎকার করে উঠল, তাদের পথরোধ করল। কুকুরের চীৎকারে জেগে উঠল গৃহস্থের সকল লোক, পাড়াপড়শীরাও। সব অপহৃত জিনিসই উদ্ধার পেল সেদিন এই বিশ্বস্ত কুকুরের জন্যে।

কুকুরের এই প্রশংসনীয় কাজ দেখে মারওয়াড়ীর আনন্দের সীমা রইল না। কুকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সে নায়েকের ঋণের টাকা মকুব করতে মনস্থ করল। এক টুকরো কাগজে "তোমার ঋণ মকুব করলাম" লিখে সেটা কুকুরটার গলায় ঝুলিয়ে সকালেই পাঠিয়ে দিল তাকে তার প্রভুর কাছে।

কুকুরটা চলল এই সু-সংবাদ বয়ে নিয়ে, কিন্তু নায়েক যখন

কুকুরটাকে দেখল তখন তার মুখ শুকিয়ে গেল, ভাবলো কুকুরটা পালিয়ে এসেছে। ক্রোধান্ধ হয়ে সে একটা লাঠি নিয়ে সজোরে মারল কুকুরটার মাথার উপর আর গর্জে উঠল, 'শয়তান, আমার মুখে চুণ-কালি মাখালি, চব্বিশ ঘণ্টাও থাকলি না সেখানে।'

লাঠির আঘাতে কুকুরটা ছটফট করতে করতে সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তখনই নায়েকের চোখে পড়ল কুকুরটার গলায় ঝোলানো সেই কাগজের টুকরো। লেখাটা পড়ে তার চক্ষুস্থির হল—এতো মস্ত একটা সুসংবাদ যা সে কল্পনাও করতে পারেনি, আর তার সঙ্গে লেখা ছিল কুকুরটার সেই রাত্রের বিস্ময়কর কর্তব্যনিষ্ঠার কথা।

দুঃখে অভিভূত হল নায়েক। অহেতুক ক্রোধ ও হঠকারিতার জন্য সে অনুতপ্ত হল। তার প্রিয় কুকুরের মৃত্যুতে সে পেল পরম দুঃখ, শপথ করল তার দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করবে সে। তার বিশ্বস্ত কুকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য সে নির্মাণ করবে এক মন্দির। এই মন্দির উৎসর্গীকৃত হবে তার কুকুরের নামে।

যথাসময়ে মন্দির নির্মিত হল। নায়েক তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করল। এই মন্দিরে পাথরে খোদাইকরা কুকুরের মূর্তি স্থাপিত হল। কালক্রমে গ্রামবাসীদের কাছে এই মন্দির পবিত্র স্থানে পরিণত হল। এই বিশ্বস্ত কর্তব্যপরায়ণ কুকুরের ইতিকথা আজও শোনা যায়। এই পাহাড়ী অঞ্চলে আজও এর উপস্থিত বুদ্ধির কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে বহুলোক।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মোজার্টের জীবনদীপ নিভে যায়। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই গীতিকারকে যেদিন সমাধিস্থ করা হয়, সেদিন ভীষণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। জল-কাদা ভেঙে সেদিন তাঁর আত্মীয়-বন্ধু কেউই সমাধিক্ষেত্রে পারেনি উপস্থিত হতে। কিন্তু কেউ যেতে পারেনি বললে ঠিক বলা হবে না। গিয়েছিল একজন। প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে বাধা দিতে

পারেনি, পারেনি নিরস্ত্র করতে। মোজার্টের ছিল এক প্রিয় কুকুর, সেই কাদা-জল উপেক্ষা করে গিয়েছিল শবাধারের সঙ্গে। আর শেষ পর্যন্ত ছিলও সেখানে।

যে বাড়িতে মোজার্ট জন্মেছিলেন, সেই স্থানেই স্থাপিত হয় এক মিউজিয়ম। এই মিউজিয়মে রক্ষিত আছে কোন এক চিত্রকরের আঁকা একটি চিত্র। চিত্রটি বর্ণাঢ্য নয়, কিন্তু তাতে আঁকা ছিল, কাদা-জল ভেঙে ছোট একটি কুকুর চলেছে সমাধিক্ষেত্রে। তার প্রভুর শেষ যাত্রা যেন নিঃসঙ্গ না হয়, সেই অব্যক্ত ব্যাকুলতা ছিল তার চোখে।

একটি অভিশপ্ত হীরে

এই হীরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের বহু বিচিত্র ঘটনা, অসংখ্য রোমাঞ্চকর কাহিনী। যুগে যুগে বহু জনের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে এর ওপর, পড়েছে লাভ ও লোভের উদগ্র লালসা। একে কেন্দ্র করে কতই না বীভৎস চক্রান্ত, লুণ্ঠন, নরহত্যা, ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে দেশে দেশে। জীবন-মৃত্যুর আঙ্গিনায় বারবার দেখা গিয়েছে এর রোমাঞ্চকর প্রভাব। প্রেমাস্পদকে উপহার দিয়ে ধন্য হয়েছে প্রেমিক। অঙ্গে ধারণ করে নারী হরণ করেছে পুরুষের হৃদয়। মনে এনেছে পুলক-শিহরন, দিয়েছে আভিজাত্যের গৌরব।

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রসিদ্ধ হীরকের জন্মস্থান ভারতবর্ষ। দিগন্ত-বিস্তৃত ছিল গোলকুণ্ডার হীরের খ্যাতি। আমাদের দেশ থেকেই কোহিনুর, গ্রেট মোগল, গ্রেট টেবল, অরলভ, রিজেন্ট বা পিট্, সাহ, নাসক, আকর সাহ প্রভৃতি কত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হীরে আজ ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে।

এই সব বিখ্যাত হীরকখণ্ডের মধ্যে ঈষৎ-সবুজ নীলাভ একটি হীরা প্রায় তিনশত বছর আগে ফরাসী পর্যটক ট্যাভারনিয়র সংগ্রহ করেন গোলকুণ্ডা থেকে। এই আকৃতি ও রং-এর হীরা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। সংগ্রহ-কালে এর ওজন ছিল ১১২½ ক্যারেট, এখন এর ওজন দাঁড়িয়েছে ৪৪½ ক্যারেট। অতি দুর্লভ রত্ন এই হীরাটি।

এই হীরকের পেছনে আছে তিন শতাব্দীর বহু বিস্ময়কর ঘটনা, বহু রোমহর্ষ কাহিনী, আর আছে রাজারানী, বিত্তশালী ব্যবসায়ী কত জনের কত বিচিত্র কথা।

রত্ন-ব্যবসায়ী পর্যটক ট্যাভারনিয়র ভারতে এসে এই হীরকটি গোলকুণ্ডা থেকে ক্রয় করলেন ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে। দেশে ফিরে গিয়ে

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইকে বিক্রয় করেন এই দুর্লভ রত্নটি ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে।

*　　　　*　　　　*

হীরাটি বিক্রয় করলেন বটে, কিন্তু এর পরেই ট্যাভারনিয়রের জীবনে দেখা দিল বিপর্যয়। বহু অর্থ আত্মসাৎ করে কোথায় সরে পড়ল তাঁর পুত্র আর চরম দুর্দশার সম্মুখীন হলেন এই প্রখ্যাত রত্ন-ব্যবসায়ী। রিক্ত নিঃস্ব অবস্থায় অশীতিপর বছর বয়সে মৃত্যু হল তাঁর। মৃত্যু হল নির্বাসনে।

বিলাস ব্যসন দুর্নীতি সব কিছুই চতুর্দশ লুইর দীর্ঘ রাজত্বকালকে কলঙ্কিত করেছিল। রাজার প্রণয়িনীর সংখ্যা ছিল অনেক, তাদের মনোরঞ্জন করতে রাজকোষ থেকে ব্যয়িত হয় অপরিমেয় অর্থ। রাজা ও রানী উভয়েরই হীরক-প্রীতি ছিল অসাধারণ—রাজা যে জমকালো পোশাক পরতেন তাতে ১৭১টা হীরার বোতাম লাগান থাকত।

রাজার প্রণয়িনীদের মধ্যে রূপসী মাদাম দ্য মঁতেপাঁ রাজার ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। রাজদরবারের এক বল-নৃত্যে এই বিচিত্র হীরকটি পরে উপস্থিত হবার বাসনা দেখা দেয় এই নারীর। রূপমুগ্ধ রাজা তার অনুরোধ রক্ষা করেন। বল-নৃত্যের সময় প্রণয়িনীটির কণ্ঠে হীরকটি ঝলমল করেছিল বটে, কিন্তু এর পর থেকেই শুরু হয় তার ভাগ্য-বিপর্যয়। অন্য এক রূপসীর ওপর রাজার লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে—দৃষ্টি পড়ে মাদাম দ্য মঁ্যাতের ওপর। এই যোগাযোগের পরেই দেখা গেছে অমিতরূপিণী মঁতেপাঁ হীরক পেয়েছেন, কিন্তু রাজার হৃদয় খুইয়েছেন। অনেকের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, এই নীলাভ হীরাটিই রাজার দীর্ঘ দিনের প্রিয়-বান্ধবী মঁতেপাঁর দুর্ভাগ্যের কারণ।

এর পর এল যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লব। মেরি আঁতোয়ানেতের ভাগ্যাকাশে দেখা দিল দীর্ঘ কালো মেঘ। এই অমিতব্যয়ী, ফ্যাসান-

প্রিয় বহু-বিড়ম্বিত রাণী শুধু নিজেই যে হীরকটি ব্যবহার করেছিলেন তা নয়, একদিন তাঁর প্রিয়-বান্ধবী রাজকুমারী লাবেঁলকেও দিয়েছিলেন এটা পরতে। বিপ্লবের সময় ওই রমণীর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে বিদ্রোহীরা প্যারীর রাস্তায় রাস্তায় প্যারেড করে ঘুরেছিল।

ফরাসী বিদ্রোহের ফলে রাণী মেরি আঁতোয়ানেতকে যে অপরিসীম দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল এবং শেষে জল্লাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল সে করুণ কাহিনী সর্বজনবিদিত। রাণীর এই শোচনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ যে এই হীরকখণ্ড এই সংশয়ও সে সময় অনেকের মনে দেখা দিয়েছিল।

*　　　　*　　　　*

ফরাসী বিপ্লবের পর প্রায় ত্রিশ বছর এই হীরকের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায় এই রত্ন। বিদ্রোহের দাবানল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে বহু ধনরত্নের সঙ্গে এই হীরকও অপহৃত হয় ১৭৯২ সালে। নেপোলিয়ন বহু চেষ্টা করেও এই দুর্লভ হীরাটির কোন সন্ধানই পাননি।

এরপর একদিন জানা গেল, ফলস্ নামে অ্যামস্টারডামের এক রত্ন-শিল্পীর কাছে আছে এই হীরাটি। চোরেরা হয়ত ফরাসী বিদ্রোহের সময় অল্প মূল্যেই বেচে দিয়েছিল তাকে। এই হীরক তখন আকারে ও ওজনে হ্রাস পেয়েছে। এটা যে সেই হারানো মূল হীরকেরই অংশ বিশেষ বিশেষজ্ঞরা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করল না। কিন্তু এখানেও এই হীরা ঘটাল বিপর্যয়। এই রত্ন-শিল্পীর পুত্র হেনড্রিক ফলস্ হীরাটি চুরি করে হঠাৎ অদৃশ্য হল। এরপর ফলসের জীবনে ঘনিয়ে এল দুর্দিন। নিঃস্ব অবস্থায় সে দেহত্যাগ করল।

ফলস্-পুত্র হেনড্রিক এই হীরকটিকে বিক্রয় করেছিল বিউলো নামে এক ফরাসীকে এবং বিক্রয় করার পর তারও ঘটে বিপর্যয়। এক রহস্যময় কারণে সে করল আত্মহত্যা।

বিউলোর কাছেও বেশীদিন ছিল না এই হীরাটি। লণ্ডনে গিয়ে

সে এক রত্ন-ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করে দেয়। হীরকটি বিক্রয় করল বটে, কিন্তু পরদিনই লণ্ডনের সোহো অঞ্চলের এক বস্তী-ঘরে সে মারা পড়ল। মৃত্যুর কারণ রইল রহস্যাবৃত।

এরপর এই হীরকের মালিক হলেন যিনি, তিনি রত্ন-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে গত শতাব্দীর প্রথমের দিকে ক্রয় করলেন এটি। মূল্য দিলেন ১৮ হাজার পাউণ্ড।

বেশ কিছুকাল এই নতুন মালিকের পরিবারে ছিল এই হীরক কিন্তু বিপর্যয় দেখা দেয় ভদ্রলোকের জীবনে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমেই। ১৯০১ সালে তিনি বিয়ে করেন আমেরিকার এক অভিনেত্রীকে। তাঁর দাম্পত্যজীবন বিড়ম্বিত, কলঙ্কিত করে এই নারী। শেষে তাকে ডিভোর্স করে তিনি নিষ্কৃতি পান। ১৯০৬ সালে ভদ্রলোক এই হীরকটি আবার এক রত্ন-ব্যবসায়ীকে বিক্রয় করে দেন।

রত্ন-ব্যবসায়ী আমেরিকানকে বিক্রয় করেন এই হীরক কিন্তু এই ক্রেতাও জড়িয়ে পড়ে আর্থিক দুর্বিপাকে। তাই সেও কিছুদিনের মধ্যেই হীরেটি এক ফরাসী ভদ্রলোককে বিক্রয় করে দেয়। কিন্তু তারও বিধিলিপি বড় বিচিত্র। লোকের ধারণা হীরে বেচেও দুর্বিপাক এড়াতে পারেনি ভদ্রলোক, তাকেও করতে হয়েছিল আত্মহত্যা।

এরপর রাশিয়ার এক রাজপুত্র ক্রয় করেন এই হীরা। কিন্তু তাঁরও পরিণাম বিস্ময়কর। ছুরিকাঘাতে হত হন তিনি।

অতঃপর এক গ্রীক ব্যবসায়ীর হাতে এসে পড়ে এই বিচিত্র হীরে। কিন্তু তিনি একে বেচে দেন তুর্কীর এক সুলতানের কাছে। মূল্য পান ৮০ হাজার পাউণ্ড। বেচে দেবার পর এই ব্যবসায়ীরও দিন ঘনিয়ে আসে—মৃত্যু হয় এক রহস্যঘন পরিস্থিতিতে।

এই হীরকের প্রভাব তুর্কীর সুলতানের জীবনেও দেখা দেয়। নানা বিপদ নানা সমস্যা কণ্টকিত করে তোলে তাঁর রাজত্বকালকে। কোনক্রমে তাঁর প্রাণ বেঁচেছিল বটে, কিন্তু সিংহাসন হারাতে হলো

তাঁকে। সুলতানের প্রণয়িনী গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা পড়ল একদিন, আর দুজন রত্নরক্ষীও নিহত হল।

*　　*　　*　　*

এবার সমুদ্র পার হয়ে এই বহু-নিন্দিত ও বহুবন্দিত হীরে পৌঁছল আমেরিকায়। নিউইয়র্কের এক প্রসিদ্ধ রত্ন-ব্যবসায়ী ক্রয় করল এই হীরা তিরিশ হাজার ডলার দিয়ে।

সম্ভবত এই ফার্মের কাছ থেকেই আমেরিকার কোনো ক্রোড়পতি এই হীরক সংগ্রহ করেন ১৯১২ সালে। মূল্য দেন ৬০ হাজার পাউণ্ড। এই জমকালো হীরা পরেই তাঁর স্ত্রী একদিন এক বিরাট ভোজে যোগ দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের পরিবারে এক বিপদ দেখা দিয়েছিল ১৯১৯ সালে। ১১ বছরের হৃষ্টপুষ্ট বালক মারা পড়ল রাস্তায় মোটর গাড়ি চাপা পড়ে। এই দুর্ঘটনার সঙ্গেও ওই হীরের যোগ কল্পনা করেছে তাদের পরিচিত জনেরা।

এই পরিবারে কত দিন হীরাটি ছিল জানি না, তবে ১৯৫৫ সালে এক ব্যবসায়ীর রত্ন-সংগ্রহে হীরেটি স্থানলাভ করে। এর পর ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে এক প্রতিষ্ঠানের হেপাজতে আসে এই হীরা। মালিক ১৯৫৮ সালে ওয়াশিংটনের কোনো প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানে এটি দান করেন। এটি এখনো এই প্রতিষ্ঠানের রত্ন-সংগ্রহে ঝলমল করছে।

ভারতের এই দুর্লভ ঈষৎ-সবুজ নীল বিচিত্র হীরের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ১৬৪২ থেকে আজ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দীর বিস্ময়কর কাহিনী। যুক্তিনির্ভর সমালোচকের কাছে এই সব কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য হয়ত বেশী নয়, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার বহু ব্যক্তি এই হীরেটিকে অশুভ রত্ন বলেই উল্লেখ করেছেন। কে জানে, কি এর রহস্য!

স্বর্ণ-সন্ধান

পাহাড়ে নদীর জলের নীচে কি একটা জিনিস চকচক করছে। জল থেকে তুলে এনে ছোট একটা পাথর দিয়ে ঘা দিলেন জেমস্ মার্শাল। ভেঙে টুকরো টুকরো হলো না, বরং ওটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল। মার্শালের মনের কোণে দেখা দিলো আশার আলোক। নাইট্রিক এসিড দিয়ে তিনি পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ম্লান হল না এর ঔজ্জ্বল্য। রূপার সঙ্গে ওজন করেও দেখা হল, কিন্তু রূপার ওজনটাই হল কম। উল্লসিত হলেন মার্শাল, 'সোনা, খাঁটি সোনা, আবিষ্কার করেছি সোনা।' এটা ১৮৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের ঘটনা। স্থান কলোমা, ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেণ্টো উপত্যকা। অগস্টাস সার্টারের এষ্টেটের মধ্যেই ঘটে এই অভাবনীয় আবিষ্কার।

মার্শাল ও সার্টার শপথ করলেন, এ খবর কাউকেই জানতে দেবেন না। প্রাণ থাকতেও না। কিন্তু আগুন আর প্রেম যেমন চাপা থাকে না, তেমনি বোধ হয় সোনার কথাও গোপন থাকে না। ছড়িয়ে পড়ল এ সংবাদ আশে-পাশে। মার্শাল প্রমাদ গুণলেন, আতঙ্কিত হলেন সার্টার। সবচেয়ে বিপন্ন হলেন বিত্তশালী সার্টার। তাঁর বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র থেকে তাঁরই ভৃত্য কেরানী কর্মীরা সব চাকরি ছেড়ে ছুটল নদীর দিকে সোনার সন্ধানে। সুযোগ বুঝে দুর্বৃত্তরা চুরি করলো তাঁর জিনিসপত্র। চরম সংকটে পড়লেন সার্টার।

সংবাদ পৌঁছল ক্যালিফোর্নিয়ায়। এখান থেকে এল সৈনিক, কৃষক, ভৃত্য, পাচক, কেরানীর দল। এল নিঃসম্বল ভাগ্যান্বেষীরাও। কেউ এল পদব্রজে, কেউ এল ঘোড়ায় চেপে, কেউ বা এল বিচিত্র সব শকটে। খঞ্জরাও বাদ পড়ল না। একজন এসেছিল এক

ডুলিতে চেপে। কর্মচারীর অভাবে বহু বিপণির দ্বার হল রুদ্ধ। ভৃত্যের অভাবে গৃহস্থ হল বিপন্ন। উন্মাদনা দেখা দিল ক্যালিফোর্নিয়ায়। সৃষ্টি হল এক অসহনীয় অবস্থার। সান্‌-ফ্রান্সিসকো, সান্‌জোস, সান্তাক্রুজ থেকে এল অসংখ্য লোক—মাঠে পড়ে রইল শস্য, অফিস-কাছারি হল বন্ধ, সৈন্যরা হল পলাতক, সংবাদপত্রের প্রকাশও প্রায় বন্ধ হল। কয়েক শত জাহাজের নাবিকেরাও ছুটলো সোনার সন্ধানে। জাহাজ রইল পড়ে পোতাশ্রয়ে।

সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে। বাল্টিমোরের 'সান' পত্রিকায় ফলাও করে এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হল। প্রথমের দিকে এটা একটা বিরাট ধাপ্পা বলে মনে করল অনেকে। কিন্তু ২৪ পাউণ্ডের একটা সোনার তাল টাঁকশালায় পরীক্ষা করে যখন ঘোষণা করা হল খাঁটি সোনা বলে এবং নিউইয়র্কে ও ওয়াশিংটনে প্রদর্শিতও হল তখন অভূতপূর্ব সাড়া জাগল সারা দেশে। সকলের মুখেই তখন এক কথা—চলো, চলো, ক্যালিফোর্নিয়ায় চলো। স্বর্ণ-সন্ধানীদের মধ্যে 'সাজ সাজ' রব উঠল :

Oh ! California !
That's the land for me !
I'm bound for Sacramento
With the washbowl on my knee.

হাড়-কাঁপানো শীতে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সহজসাধ্য নয়। কিন্তু তবুও অক্টোবর মাসেই বেরিয়ে পড়ল স্বর্ণ-লোভীর দল। কেপ হর্ন ঘুরে. পানামা যোজক পার হয়ে ছুটলো তারা স্বর্ণের সন্ধানে। দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল জলপথ ছোট-বড় নানাপ্রকারের নৌকোয় পার হয়ে পৌঁছল এসে ক্যালিফোর্নিয়ায়। ভিড়ের চাপে কত তরী যে তলিয়ে গেল জলের নীচে, কত লোকের যে সলিল-সমাধি হল তার হিসেব নেই।

বসন্তকাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণসন্ধানীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। দুর্বার স্রোতের মত স্থলপথ দিয়ে আসে নানাশ্রেণীর লোক। মরুভূমি পার হয়ে, দুর্গম পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, ঝড়-ঝঞ্ঝা, হিংস্র জন্তু উপেক্ষা করে, দীর্ঘ বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে আসে তারা। হাজার হাজার শ্বেতকায় ব্যক্তি যখন রেড-ইণ্ডিয়ানদের বসতিপূর্ণ গ্রামের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে তখন এই নবাগতের দলকে দেখে তারা আতঙ্কিত হয়, তাদের শত্রু বলেই মনে করে। বাধে সংঘর্ষ। পাহাড়, উপত্যকা, মরুভূমি আকীর্ণ হয় মৃতদেহে; অগ্নিদগ্ধ গাড়ি পড়ে থাকে রাস্তার ওপরে। পথে-প্রান্তরে জমে নরকংকাল। দেখা গেল ১৫ মাইল পথের মধ্যে ৩৬২টা গাড়ি রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ৩৫০টা ঘোড়া, ২৮০টা ষাঁড় এবং ১২০টা গাধার মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। হাজার হাজার বিপন্ন নরনারী সাহায্যের জন্যে সৈন্যবাহিনীর কাছে জরুরী আবেদন জানায়।

বছর দুয়ের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় জনসংখ্যা বিপুলতর হয়ে ওঠে। এবার শুরু হয় ইতিহাসের বৃহত্তম স্বর্ণ-সন্ধানীদের অভিযান —'গোল্ড রাশ।' জার্মানী থেকে, ফ্রান্স থেকে আসে স্বর্ণলোভীর দল, আসে মেক্সিকো, চিলি, পেরু, অষ্ট্রেলিয়া থেকেও। আসে চীনারাও। শুধু আসা নয় বাসাও বাঁধে তারা। গড়ে ওঠে নানা শ্রেণীর, নানা পেশার লোকের বসতি। পত্তন হয় বিচিত্র সব নামের শহর—স্কোয়াবল্ টাউন, বোগাস থাণ্ডার, ফিড্ল টাউন, রাফ অ্যাণ্ড রেডি, হুডুবার, ইউ বেট, রেড ডগ ইত্যাদি। আকাশ-ছোঁয়া দরে জিনিসপত্র বিক্রি হয়। কয়েকটা আলু কিনতে লাগে এক পাউণ্ড। একটা ডিমের দামও এক ডলার। একটা কোদাল বিক্রি হয় একশ ডলার মূল্যে। কিন্তু তা হলে কি হয়, সোনা তো মিলছে এখানে। সকলেই তো কিছু না কিছু সোনা পাচ্ছে স্বল্পায়াসে। তাই বিলাস-সামগ্রী কিনতেও অর্থের অভাব ঘটে না কারুরই। আর কেউ যদি কোনও দিন একটা বড় সোনার তাল পেয়ে যেত তাহলে তো কথাই

নেই, মস্ত বড় একটা ভোজেরই আয়োজন করে ফেলত। মদ খেয়ে, জুয়ো খেলে, ফুর্তি করে সারা রাতটাই কাটিয়ে দিত। ১৮৫৩ সালে ৬৭,৬১৩,৪৮৭ ডলার মূল্যের সোনা পাওয়া যায় এখানে।

নিরাপত্তার অভাব ঘটে ক্যালিফোর্নিয়ায়। চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম, রাহাজানি দেখা দেয় নগ্নরূপেই। গড়ে ওঠে ডাকাতের দল। স্বর্ণবাহী শকটকে রাস্তায় আটক করে দুর্বৃত্তেরা লুট করতে থাকে সোনা। ডুয়েল, দাঙ্গা, হত্যায় বেশ কয়েক হাজার লোকের জীবনহানি ঘটে। কিন্তু এই গোল্ড রাশ-এর সুফলও দেখা দেয় শীগগির। অখ্যাত পল্লী সানফ্রানসিসকো কয়েক মাসের মধ্যেই শহরে পরিণত হয়, তিন বছরের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার জনসংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ৯২ হাজারে ওঠে। ১৮৫০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকার ৩১তম ষ্টেটরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়। বোষ্টন শহর দ্রুতগামী জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পানামা খাল খনন করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয় এই গোল্ড রাশ-এর ফলে।

কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। যার বিস্তৃত এষ্টেটের মধ্যে সোনা আবিষ্কৃত হয়, তার কিন্তু ভাগ্য পরিবর্তন হয় না। অগস্টাস সাটারের ভাগ্যে জোটে শুধু বিড়ম্বনা। স্বর্ণ-সন্ধানীরা যখন তাঁরই এষ্টেটকে তছনছ করছে তখন তিনি ছিলেন অসহায় দর্শক, নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার সাধ্য ছিল না তাঁর। বিচারপ্রার্থী হয়ে সুপ্রীম কোর্টে মামলা রুজু করেন, কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই বিফল হয়। কংগ্রেসের কাছেও তিনি আবেদন-নিবেদন করেন, কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়। এই ধনী ব্যবসায়ী ৭৭ বছর বয়সে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ওয়াশিংটনে মারা যান। সাটার্স গোল্ড-এর অর্থ, যার সোনা সেই ভোগ করতে পারে না।

ক্যালিফোর্নিয়ার এই গোল্ড-রাশের সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়ে নানা দেশে তখন স্বর্ণলিপ্সা সংক্রামক হয়ে দাঁড়ায়। সমুদ্রের তীরে, রকি পর্বতের গহন অঞ্চলে, অচেনা অজানা স্থানে ছোটে স্বর্ণ

অন্বেষণকারীর দল। ১৮৫৮ সালে কলাম্বিয়ার ফ্রেজার নদীতে সোনার সন্ধান মেলে। দলে দলে ব্যবসায়ী, রেড ইণ্ডিয়ান, নানা পেশার লোক আসতে থাকে এখানে। ক্যালিফোর্নিয়ার মত এখানে অবশ্য অবাধ স্বাধীনতা ছিল না। ইচ্ছামত যত্রতত্র সোনা আহরণ করতে দেওয়া হত না। গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে লাইসেন্স না নিলে হাজতবাসের ব্যবস্থা করা হত। সোনাও বাজেয়াপ্ত হত। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় ২৫ হাজার লোক এই গোল্ড-রাশ-এ অংশ গ্রহণ করে।

সোনা আবিষ্কৃত হয় আমেরিকার আরও কয়েকটি স্থানে। এদের মধ্যে ক্যারিবু (১৮৬২), নারভেদা (১৮৫৯), কোলারডো (১৮৫৭), ইদাহো (১৮৬০), মনটানা (১৮৬২), সাউথ ডাকোটার (১৮৭৬) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আলাস্কার ক্লনডাইক-এ গোল্ড-রাশ শুরু হয় ১৮৯৭ সালে। বহু প্রকার ভাগ্যান্বেষী আসে ক্যানেডার এই অঞ্চলে। পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলারের সোনা পাওয়া যায় এই ক্লনডাইক স্থান থেকে। রবার্ট হেণ্ডারসন এই ক্লনডাইক স্বর্ণক্ষেত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে জোটেনি কোনও অর্থ, কোনও সম্মান, কোনও মর্যাদা। তাঁর দাবী স্বীকৃত হয়নি, কপর্দকহীন অবস্থাতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের র‍্যাণ্ড জেলায় সোনা আবিষ্কৃত হয় ১৮৮৬ সালে। এই স্বর্ণক্ষেত্র থেকেই সবচেয়ে বেশী সোনা পাওয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়াই বা বাদ পড়বে কেন এই গোল্ড-রাশ থেকে? এখানেও নানাস্থানে অত্যুৎসাহী স্বর্ণশিকারীর দল সন্ধান পায় সোনার। ভিকটোরিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় মূল্যবান সোনা। বিপুল উত্তেজনা দেখা দেয় এখানে। সরকারী, বেসরকারী কাজকর্ম অচল হয়, শহর খালি হয়ে যায়, অসংখ্য লোক ছোটে সোনার সন্ধানে। স্বর্ণক্ষেত্রে যাবার পথঘাট গাড়িঘোড়া আর পথচারীদের ভিড়ে অস্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করে। খনিকর্মীদের সমাগমে মেলবোর্ণ

শহর কেঁপে ওঠে। ক্যালিফোর্নিয়ার অনুকরণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বর্ণখনি থেকে সোনা আহরণ করা হয় এখানে। ১৮৯৬ সালের মধ্যেই কিন্তু এই গোল্ড-রাশ বন্ধ হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কোলার স্বর্ণ খনিরও কথা বলা যেতে পারে। প্রায় ১০,০০০ ফুট গভীর খাদের ভিতর থেকে সোনা খুঁড়ে বের করা হয়। টানেল কাটা হয়েছে প্রায় ৬৫০ মাইল। অনেকে বলেন, কোলার স্বর্ণখনি হচ্ছে এখন বিশ্বের গভীরতম স্বর্ণখনি। আধুনিক খনি-বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির সাহায্যেই খনির কাজ চলে। খনির অভ্যন্তরে ১৫০ ডিগ্রী (ফাঃ) পর্যন্ত উত্তাপ হয়। এই উত্তপ্ত পরিবেশে কাজ করতে হয় খনিকর্মীদের। অবশ্য তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নানাভাবেই করা হয়। সুগভীর খনিগর্ভে এলিভেটারের সাহায্যে কর্মীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। এক মাইল দেড় মাইল খাদে নামতে লাগে মাত্র তিন মিনিট। এই স্থান থেকে প্রতি মাসে প্রায় ১০,০০০ আউন্স সোনা পাওয়া যায়। এ হচ্ছে পৃথিবীর মোট স্বর্ণ-উৎপাদনের শতকরা প্রায় তিন ভাগ।

সমুদ্রের জলে আছে নানারকম খনিজ পদার্থ। আছে আইয়োডিন, ম্যাগনেসিয়াম, পেট্রোলিয়াম, রূপা, তেল, আরও কত কি। এই বিশাল জলরাশির মধ্যে আছে প্রচুর সোনা। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন এক কিউবিক মাইল সমুদ্রের জলে আছে ৯৩,০০০,০০০ ডলার মূল্যের সোনা এবং ৮৫,০০,০০০ ডলার মূল্যের রূপা। সমুদ্রের জলরাশি থেকে সোনা আহরণ তো সহজ নয়। কিন্তু যাঁরা এই দুরূহ কাজে ব্রতী হন, তাঁদের মধ্যে জার্মান কেমিস্ট হেবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই বৈজ্ঞানিক বলেন, সমুদ্র থেকে প্রচুর সোনা পাওয়া সম্ভব আর সেই সোনা দিয়ে যুদ্ধের সব ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে। জার্মান সাউথ অ্যাটলান্টিক এক্সপিডিসান শুরু হয়। জাহাজের নাম মিটিয়র। এই জাহাজকে বীক্ষণাগার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাপাতি সব

কিছু দিয়ে সজ্জিত করা হয়। কিন্তু অভিযান চালিয়ে লাভ হয়নি কিছুই। জল থেকে সোনা বের করতে যা খরচ পড়ে, তা সোনার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। তাই এই অভিযান পরিত্যক্ত হয়। একদিন হয়তো বিজ্ঞানের সাহায্যে সমুদ্র থেকে প্রচুর সোনা আহরণ করা সম্ভব হতে পারে। এমন কি সেকালের অ্যালকেমিস্টদের স্বপ্ন বৈজ্ঞানিকেরা সার্থক করেও তুলতে পারেন। কিন্তু তখন কি সোনার মূল্য ও মর্যাদা আজকের মতোই থাকবে ?

আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সোনা পাওয়া গেছে ২,১১২,০০০,০০০ ট্রয় আউন্স। এই সোনাকে একটা ঘন বা কিউব আকারে পরিণত করলে এর প্রত্যেক বাহু হবে প্রায় ৪৯ ফুট। এই সোনাকে যদি পিটিয়ে সরু পাতে পরিণত করা যায় তাহলে এর দৈর্ঘ্য হবে ১০৫,৬০০,০০০,০০০ মাইলেরও বেশী।

নেকড়ে বালক

সুলতানপুর থেকে মাইল দশেক দূরের গ্রাম চন্দৌর। এই গ্রাম-সংলগ্ন ছোট এক নদীর ধার দিয়ে চলেছে এক সিপাই, চলেছে খাজনা আদায় করতে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য—একটা নেকড়ের সঙ্গে তার তিনটে বাচ্চা আর এক অদ্ভুতদর্শন বালক। হাত ও পায়ের ওপর ভর দিয়ে নগ্নকায় বালকটি চলছে স্বচ্ছন্দে, সমান তালে। নেকড়ের সঙ্গে তার চলনভঙ্গির কোন পার্থক্যই নেই। সিপাই দেখল, নেকড়েটা সজাগ সস্নেহ দৃষ্টি রেখেছে যেমন তার বাচ্চাদের ওপর তেমনি এই বালকের ওপরও। হিংস্র আরণ্যক পরিবেশের ছাপ পড়েছে তার সর্বাঙ্গে।

নেকড়ের সঙ্গে এই নোংরা কদাকার বালককে দেখে সিপাই বিস্ময়াবিষ্ট হল, কৌতূহল জাগল তার মনে। যেমন করেই হোক একে এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধরে ফেলবার ইচ্ছা হল তার। নদীতে জল খেয়ে যখন তারা গিরিবর্ত্মে ফিরতে যাবে তখনই সিপাই ছুটলো তাদের দিকে। কিন্তু তাদের গতি এমনই ক্ষিপ্র ছিল যে, সিপাইয়ের ঘোড়া তাদের নাগালই পেল না। ঢুকে গেল তারা গিয়ে তাদের নিভৃত আশ্রয়ে।

সিপাই কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নয়। আশেপাশের লোকদের সাহায্যে অবিলম্বে গর্ত খোঁড়া আরম্ভ করে দিল। প্রায় আট ফুট খোঁড়া হয়েছে এমন সময় নেকড়েটা তার বাচ্চাগুলো আর বালকটাকে নিয়ে ছুটতে লাগল অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু সিপাই সেই মুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে সুকৌশলে বালকটাকে ধরে ফেলল, আর তাড়িয়ে দিল নেকড়ে আর তার বাচ্চাদের বনান্তরালে।

এই মনুষ্য-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নোংরা বালকটিকে নিয়ে সিপাই

খেয়ে ফেলে। গ্রামের ছেলেরা ব্যাঙ ধরে ছুঁড়ে দেয় তার কাছে আর তাও সে খায় পরম উল্লাসে।

বালকটিকে যখন উদ্ধার করা হয় তখন তার বয়স প্রায় ন দশ বছর হবে। আর তারপর সে বেঁচেছিল বছর তিনেক। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে মাথায় হাত দিয়ে কেবলমাত্র জানিয়েছিল যন্ত্রণা হচ্ছে বলে। আর একটু জলও চেয়েছিল সে। একটু জল খেয়েই জগৎ থেকে চিরবিদায় নেয় সে।

স্যার উইলিয়ম হেনরি স্লীম্যান আরও কয়েকটি নেকড়ে বালকের বিবরণ দিয়েছেন। নেকড়ে অধ্যুষিত গোমতি নদীর তীরবর্তী গিরিসঙ্কটের মধ্যে হারানো সব শিশুর কথা। এই প্রসঙ্গে তাঁর শতাব্দীকাল পূর্বের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

বেশ কয়েক বছর নেকড়ের সঙ্গে বাস করে, অপরিচ্ছন্ন হিংস্র পরিবেশের মধ্যে থেকে মানুষের স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তিগুলোকে সে ফিরে পেতে পারে না। অনেক শিশুকেই নেকড়েরা চুরি করে নিয়ে যায় কিন্তু সেইসব শিশু উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে যখন ফিরে আসে মনুষ্য-সমাজে তখন তাদের আকৃতি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। তাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করা হয় দুঃসাধ্য। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়। মানব সমাজের উন্নত পরিবেশের সঙ্গে তারা আর নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না।

যে সব হারানো শিশুকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় তারা বেশীদিন বাঁচে না। বাঁচলেও স্বাভাবিক মানুষের মত বাঁচে না। যারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় না তারাও নেকড়েদের সঙ্গে কিছুকাল থাকার পর বিলুপ্ত হয়ে যায়। হিংস্র জন্তুর কাছে তারা পরিণত বয়স পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। শিকারলব্ধ কাঁচা মাংস খেয়ে দীর্ঘকাল বাঁচাও হয়ত সম্ভব নয়। বনের হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ে তারা নিহত হয়, নিশ্চিহ্ন হয়, তাদের খাদ্যে পরিণত হয়। যে নেকড়ের আশ্রয়ে এরা থাকে সেই নেকড়ের মৃত্যুর পর এদের লালনপালন করার ভার

নেবে কে? তাই এই পরিবেশে তাদের পক্ষে বেশীদিন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

এসব তো শতাধিক বছর আগের কথা। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মেদিনীপুরের এক পল্লীঅঞ্চল থেকে মিশনারী সিং সাহেব নেকড়ের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন দুটি বালিকাকে।

একদিন এই মিশনারীর কাছে খবর পৌঁছল। এক গ্রামে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। তিনি সন্ধ্যার সময় টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখতে পান এক গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে একটা নেকড়ে, তার দুটো বাচ্চা, আর একটা অদ্ভুতদর্শন কদাকার প্রাণী, যার শরীরটা মানুষের মত কিন্তু হাঁটছে সে হাঁটু আর হাতের উপর ভর দিয়ে ঠিক নেকড়ের মতই। ভূতের ভয়ে কোন গ্রামবাসীই সেই গর্তের কাছে যেতে চাইল না। শেষে পাশের গ্রাম থেকে লোকজন এনে সেই দশ ফুট উঁচু উইয়ের ঢিপি খুঁড়তে লাগান হল তাদের।

খোঁড়া হলে দেখা গেল সেই গর্তের এক নিভৃত কোণে কুণ্ডলী পাকান অবস্থায় শুয়ে আছে দুটো নেকড়ের বাচ্চার সঙ্গে দুটো বালিকা। মানুষ দেখামাত্রই এরা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কামড়াতে এল।

এই দুটি বালিকার মধ্যে একজনের বয়স হবে আট বছর আর একজনের দেড় বছর। পাদ্রী সাহেব এদের নিয়ে এলেন এক অনাথাশ্রমে। দেখা গেল তাদের হাঁটুতে, কনুইয়ে, পায়ের পাতায় আর হাতের চেটোতে কলোসাইটিস হয়েছে সব সময় চতুষ্পদ জন্তুদের মত চলাফেরার জন্যে।

দিনের বেলা এরা ঘুমতো বা ঢুলতো কিংবা চুপ করে দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকতো। কিন্তু রাত্রি হলেই এরা চঞ্চল হয়ে উঠতো, হিংস্র স্বভাব জাগত মনে। ঘুমোত এরা কুণ্ডলী পাকিয়ে।

রাত্রি দশটা, একটা আর তিনটের সময় এরা ঠিক নেকড়ের মত ডাক দিত। দূরে থেকে কাঁচা মাংসের গন্ধ বুঝতে পারত এরা এবং কাঁচা মাংসই খেতে চাইত বেশী। ছাগল কিংবা কুকুর দেখলে তাদের

সঙ্গ ছাড়তে চাইত না। কিন্তু কোন বালক বালিকা দেখলেই দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াতে আসত তাদের।

ধরা পড়ার ১১ মাস পরে ছোট মেয়েটি মারা গেল, এর মৃত্যুর পর বেশ কয়েক দিন অন্য বালিকাটি কিছুই খেতে চাইত না। দশ দিন পরে দেখা গেল বালিকাটি যেখানে থাকত সেই জায়গা শুঁকে বেড়াচ্ছে।

এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিদিন মালিশ করার পর আঠারো মাস পরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত কিন্তু দৌড়াতে পারত না। পাঁচ বছর পরে দেখা গেল টেবিলের ওপর কাঁচা মাংস রাখলে সে তা চুরি করে খেত না। কিন্তু সে কখনও হাসেনি। বালিকাটি মারা যাবার পরে চোখ থেকে কেবল দু-এক ফোঁটা জল গড়িয়ে ছিল তার।

একে উদ্ধার করার এক বছর পর মাত্র দুটি কথাই সে বলতে পেরেছিল—মিশনারীর স্ত্রীকে "মা" আর ক্ষিদে বা তিষ্টে পেলে "ভু"। দু বছর পরে দুটি শব্দ বলতে পারত আর প্রশ্ন করলে কিছু বুঝতেও পারত। তিন বছর পরে ৪৫টি শব্দ সহজ বাক্যে ব্যবহার করতে শিখেছিল। মৃত্যুর পূর্বে এর একটু দায়িত্ববোধও জন্মেছিল, কারণ তার জিম্মায় অনাথাশ্রমের শিশুদের রাখা হলে এই দায়িত্ববোধের কিছু পরিচয় সে দিত। এই দুই বালিকার নাম অমলা ও কমলা।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, অন্য দেশেও নেকড়ে-লালিত শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত ফ্রান্সের এভিরণের বন্য বালকের (Wild boy of Aveyron) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন এক বনপ্রান্ত থেকে একে পাওয়া যায় তখন এর বয়স ছিল ১১। সোজা হয়ে হাঁটতে পারত না, পশুদের মত শব্দ উচ্চারণ করত আর গায়ে ছিল পঁচিশটা আঁচড়-কামড়ের দাগ। অত্যন্ত নোংরা, আস্ত একটা ইডিয়ট।

এই বালককে আনা হয় প্যারী নগরীতে। একে দেখে লোকের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। রুশোর অনুরাগীদের মধ্যে বিপুল সাড়া

পড়ে যায়। সভ্যতার ছোঁয়াচ থেকে দূরে থাকা বন্য পশুর আশ্রয়ে পালিত এই বুদ্ধিভ্রংশ বালকের প্রতি তাদের দরদ উথলে পড়ে।

ডঃ ইটার্ড ভার গ্রহণ করেন এর মানসিক অবনতি, এর জড়ত্ব ও নোংরা স্বভাব দূর করে একে সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। বছর দুই চেষ্টার পর তিনি এর আকৃতি প্রকৃতির কিছু পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। তাঁর শিক্ষার ফলে সে নিজের পোশাক নিজেই পরতে শিখেছিল, আর কথা বললে কিছু কিছু বুঝতেও পারত। কিন্তু এই পর্যন্তই। রামুর কথাও বলি। দশ বছর বয়সের এই বালককে ভর্তি করা হয় লক্ষ্ণৌর এক হাসপাতালে ১৯৫৪ সালে। এর পর সে অবশ্য ২৪ বছর বেঁচেছিল কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়নি।

মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিদ্যার গবেষকদের কাছে এই সব তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান। মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব কত ব্যাপক ও গভীর হতে পারে তাই নিয়ে যে প্রচুর গবেষণা চলেছে সেই গবেষণার কিছু উপাদান যুগিয়েছে এই সব নেকড়ে-পালিত শিশু। অতি শৈশবে মনুষ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক হিংস্র আরণ্যক পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘদিন কাটাবার ফলে যে মানসিক ও শারীরিক অবনতি ঘটে উপযুক্ত শিক্ষা যত্ন ও সেবার দ্বারা তার কতদূর পরিবর্তন করা যায় এটাই হচ্ছে মনোবিজ্ঞানীদের কাছে এক জটিল সমস্যা। যেসব বালক-বালিকার বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা, আবেগ অনুভূতি প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি অস্বাস্থ্যকর অবাঞ্ছিত পরিবেশের প্রভাবে রুদ্ধ হয়েছে, ব্যাহত বা বিকৃত হয়েছে তাদের কেমন করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, কেমন করে তাদের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করা যায় তাই নিয়ে এখন বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। নেকড়ে-পালিত মানব-শিশুদের বিচিত্র জীবন যে সকল শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীকে গবেষণার নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে তাদের মধ্যে প্রখ্যাত শিশু-শিক্ষাবিদ ম্যাডাম মন্তেশ্বরী অন্যতম।

আলেকজাণ্ডার ও ভারতীয় যোগী

প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাস অমৃত সমান। অসংখ্য মুনি-ঋষি, যোগী-সন্ন্যাসীর তপশ্চর্যার বিস্ময়কর কাহিনী ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছে। দিগ্‌বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে আগমন করেন তখন তিনি ভারতীয় যোগীদের সান্নিধ্যলাভ করে ও তাঁদের প্রজ্ঞা ও সাধনার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। তাই দেশে ফিরে যাবার সময় জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতীয় যোগীকে সঙ্গে নিয়ে যান। ইতিহাসে এঁরা 'জিমনোসফিষ্ট' নামে অভিহিত; আমারা এঁদের বলছি যোগী।

ভারতে এসে আলেকজাণ্ডার যোগীদের অধ্যাত্ম সাধনা ও দার্শনিক মতবাদের নানা কথা শুনলেন। আগ্রহান্বিত হলেন তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। তাই তিনি ওনেসিক্রিটাসকে পাঠালেন প্রখ্যাত যোগীর সন্ধানে। ওনেসিক্রিটাস বলেন, যোগীদের যখন বলা হল রাজা তাঁদের অধ্যাত্ম-জ্ঞান সম্বন্ধে জানতে চান, তখন তাঁদের মধ্যে একজন উত্তর দিয়েছিলেন, ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত কোন ব্যক্তি তাঁদের কাছে এলে তাঁদের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারবে না, জানতে হলে তাকে আসতে হবে নগ্নগাত্রে এবং তাঁদের কাছে বসতে হবে তপ্ত পাথরের ওপর।

ওনেসিক্রিটাস একদিন এলেন নিঃশঙ্কচিত্ত ভারতীয় যোগী দান্দামিসের কাছে (Greek Dandamis)। সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে তাঁকে বললেন 'জিউসের পুত্র মহামান্য সার্বভৌম সম্রাট আলেকজাণ্ডার আপনাকে তাঁর কাছে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, আপনি যদি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন তাহলে বহুমূল্য উপহার দিয়ে তিনি আপনাকে পুরস্কৃত করবেন, আর যদি তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করেন তাহলে তিনি আপনার শিরচ্ছেদ করবেন।'

দান্দামিস্ তখন তৃণশয্যায় শায়িত। মুখে তাঁর গভীর প্রশান্তি। মন দিয়ে সব কথাই তিনি শুনলেন। বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, এমন কি শয্যা থেকে মাথাটি পর্যন্ত তুললেন না। তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে উত্তর দিলেন :

'ঈশ্বরই সর্বময় রাজা। তিনি আলো, শান্তি, জল, জীবন, মানবদেহ ও আত্মার সৃষ্টি করেছেন। কেবল তাঁকেই আমি প্রণতি জানাই। তিনি নরহত্যাকে ঘৃণা করেন, যুদ্ধবিগ্রহকে প্রশ্রয় দেন না।'

'আলেকজাণ্ডার ঈশ্বর নন, তাঁকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। আর তিনি সার্বভৌম রাজাও নন।'

দান্দামিস্ বলে চললেন, 'জেনে রেখো, আলেকজাণ্ডার আমাকে যা দিতে চায় তা মূল্যহীন, কিন্তু আমার কাছে যা মূল্যবান তা হচ্ছে এই সব বৃক্ষপত্র যা আমার আশ্রয়, এই সব ফলদায়ী গাছ যা আমাকে দেয় খাদ্য, আর এই জল যা আমার পানীয়।

'আমি তো তৃণশয্যায় শয়ন করি। যেহেতু আমার কোন কিছু সম্পত্তি নেই যাকে পাহারা দেওয়া প্রয়োজন, আমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই। আমার যদি ধন-সম্পদ থাকতো তাহলে তো শান্তিতে ঘুমোতেই পারতাম না, পাহারা দিতেই রাত কেটে যেত।

'পৃথিবীই আমাকে সকল প্রয়োজনীয় জিনিস দেয়, যেমন শিশুকে দুধ দেয় তার মা। যেখানে ইচ্ছা সেখানেই যেতে পারি আমি, কোন ভাবনা-চিন্তা আমার জীবনকে ভারাক্রান্ত করতে পারে না।

'আলেকজাণ্ডার আমার মাথা কেটে নিতে পারে কিন্তু আমার আত্মার বিনাশ সাধন করতে পারবে না। জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় আমার মৃতদেহ পড়ে থাকবে কিন্তু আমার আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে লীন হয়ে যাবে।'

দান্দামিস্ আরও বলেন, 'যারা অর্থ ও ঐশ্বর্য চায় তাদের এই সব কথা বলে ভীতিপ্রদর্শন করুক এবং যারা মৃত্যুকে ভয় করে

তাদেরও। কিন্তু আমাদের কাছে এই সব ভীতি প্রদর্শন অর্থহীন, কেন না আমরা অর্থ চাই না, মৃত্যুকেও ভয় করি না।'

এর পর দান্দামিস্ তেজদৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনি আলেকজাণ্ডারকে গিয়ে বলুন, আপনার যা কিছু আছে দান্দামিস্ তা চায় না, তাই সে আপনার কাছে যাবে না। কিন্তু আপনার যদি দান্দামিসে কাছে কিছু প্রয়োজন থাকে তাহলে আপনাকেই দান্দামিসের কাছে আসতে হবে।'

ওনেসিক্রিটাসের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের এই বিবরণ জানতে পেরে দান্দামিসের সঙ্গে দেখা করবার প্রবল ইচ্ছা হল আলেকজাণ্ডারের। দান্দামিস হচ্ছেন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী যাঁর কাছে এই দিগ্‌বিজয়ী বীরের পরাজয় ঘটে।

আলেকজাণ্ডার যে সকল ভারতীয় যোগীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন তীক্ষ্ণধী, স্বল্পবাক, নিঃশঙ্ক। তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করে তাঁদের জ্ঞানের পরিধি পরীক্ষা করেন। কয়েকটি সর্তও আরোপ করেন এই পরীক্ষায়। প্রথমে যে ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ উত্তর দেবে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং তার পর একে একে সবকেই। তাঁদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই হবেন বিচারক। আলেকজাণ্ডার যোগীদের পর পর প্রশ্ন করেন আর তাঁরা একের পর এক উত্তর দেন :—

প্রথম প্রশ্ন—সংখ্যায় কারা সবচেয়ে বেশী, মৃত না জীবিত ব্যক্তিরা ?

উত্তর—যারা বেঁচে আছে তারাই, কেননা যারা মৃত তারা তো আর বেঁচে নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—সবচেয়ে বৃহৎ জন্তুর জন্ম হয় কোথায় ? পৃথিবীতে না সমুদ্রে ?

উত্তর—পৃথিবীতেই, কেননা সমুদ্র হচ্ছে পৃথিবীর অংশ।

তৃতীয় প্রশ্ন—কোন জন্তু সবচেয়ে চতুর ?

উত্তর—সেই জন্তুর সঙ্গে মানুষের এখনও পরিচয় ঘটেনি।

চতুর্থ প্রশ্ন—সাভাসকে বিদ্রোহ করতে কেন প্ররোচিত করা হয়েছিল?

উত্তর—কারণ, আমার ইচ্ছা ছিল হয় সে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকুক, নতুবা কাপুরুষের যেমন ভাবে মরা উচিত তেমনিভাবে মরুক।

পঞ্চম প্রশ্ন—সবচেয়ে বড় কে? রাত্রি না দিন?

উত্তর—রাত্রির চেয়ে দিনই একদিনের বড়।

এই উত্তরে আলেকজাণ্ডার বিস্মিত হলেন। তাঁর বিস্ময় লক্ষ্য করে উত্তরদাতা বললেন, 'দুর্বোধ্য প্রশ্নের এইরূপ দুর্বোধ্য উত্তরই হয়ে থাকে।'

ষষ্ঠ প্রশ্ন—লোকের ভালবাসা পেতে হলে শ্রেষ্ঠ উপায় কি?

উত্তর—প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও কারুর ভীতির কারণ না হওয়া।

সপ্তম প্রশ্ন—মানুষ কি করে দেবত্ব লাভ করতে পারে?

উত্তর—মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব তাই করে।

অষ্টম প্রশ্ন—কার শক্তি বেশী, জীবনের না মৃত্যুর?

উত্তর—জীবনের, কেন না জীবনই তো বহন করে বহু অমঙ্গল (evils)।

নবম প্রশ্ন—কতকাল মানুষের বেঁচে থাকা ভাল?

উত্তর—যতদিন না সে জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে চায় (As long as he does not prefer death to life.)।

এই নয়জনের উত্তর শোনার পর আলেকজাণ্ডার বিচারককে তাঁর অভিমত জানাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। বৃদ্ধ বিচারক বললেন, 'আমার মতে এদের প্রত্যেকের উত্তর প্রত্যেকের উত্তরের চেয়ে নিকৃষ্ট।'

আলেকজাণ্ডার তখন বললেন, 'এই যদি আপনার বিচার হয়, তাহলে আপনাকেই তো প্রথম মৃত্যু বরণ করতে হবে।'

এর উত্তরে বিচারক বললেন, 'তা তো হতেই পারে না, অবশ্য

আপনি যদি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন তাহলে অন্য কথা। আপনিই তো ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ উত্তর দেবে সেই প্রথম প্রাণ হারাবে।'

এই উত্তরে আলেকজাণ্ডার প্রীত হন এবং যোগীদের নানা উপহার প্রদান করেন।

আলেকজাণ্ডার ফিরছেন তাঁর দেশে। সঙ্গে আছে ব্যাবিলনের জ্যোতির্বিদ, থিবসের গণিতজ্ঞ আর ভারতের প্রাজ্ঞ যোগী সন্ন্যাসী।

ভারতীয় যোগীদের মধ্যে কল্যাণের (Kalyanas) নামই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অধ্যাত্ম সাধনায় তিনি ছিলেন ভারতের মূর্ত প্রতীক। তিনি তখন বৃদ্ধ; সঙ্গে ছিল কেবলমাত্র একটা কুশাসন আর একটা পাত্র। এ ছাড়া আর কোন সম্বল ছিল না তাঁর। সেই কুশাসনের ওপর বসে তিনি তপস্যা করতেন আর খাবার প্রয়োজন হলে সেই পাত্র থেকেই আহার্য গ্রহণ করতেন। খাবার অবশ্য তাঁর বেশী প্রয়োজন হত না। বেশির ভাগ সময়ই তিনি নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। আলেকজাণ্ডার তাঁর কাছে এলে তিনি অবশ্য বাক্যালাপ করতেন, কিন্তু এই দিগ্‌বিজয়ী বীরের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি কখনও তাঁর প্রশংসাসূচক কোন কথাই বলতেন না।

কল্যাণ একদিন আলেকজাণ্ডারকে উপদেশ দেন, 'আপনি অনেক দেশ জয় করেছেন আর ধ্বংসও করেছেন অনেক, কিন্তু মনে রাখবেন আপনার অস্ত্রশস্ত্র, ঐশ্বর্য বা সব বন্দী জীবজন্তু আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে না।'

অন্য এক সময় কল্যাণ তাঁকে রাজনীতি শিক্ষা দেন। একটি শুকনো কুঞ্চিত চামড়া তাঁর সামনে রেখে তার ওপর পদচারণা করেন। প্রথমে তিনি চামড়াটার ধারে ধারে পদক্ষেপ করেন। এক ধারে পায়ের ভর দিলে অন্য ধার উঁচু হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি যখন মাঝখানে পা রাখেন তখন ধারগুলো উঁচু হয় না। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি আলেকজাণ্ডারকে বুঝাতে চেয়েছিলেন, নিজের রাজ্যের মধ্যেই

তাঁর থাকা উচিত ছিল এবং রাজ্যের মধ্যেই সৈন্যবাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করা উচিত ছিল। নিজের রাজ্যের সীমার বাইরে আসা উচিত হয়নি।

কল্যাণের কথাগুলো আলেকজাণ্ডারের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। কল্যাণ যে দৈবশক্তির অধিকারী পরম প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

আলেকজাণ্ডার তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কেন আমাদের দেশে এলেন?' বিরক্তির সুরে কল্যাণ উত্তর দেন, 'আপনি কেন গিয়েছিলেন ভারতে? আপনার তো উচিত ছিল রাজ্যের মধ্যেই থাকা, রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে লুটপাট করা উচিত হয়নি আপনার।'

একদিন এক পত্রবিরল গাছের নিচে বসে আছেন আলেকজাণ্ডার। এই সময় দেখা হয়ে গেল কল্যাণের সঙ্গে। যোগীবর বললেন, 'আপনি পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করলেন কিন্তু আপনার যখন মৃত্যু হবে তখন মৃতদেহকে ঢাকা দেবার জন্য যে পরিমাণ মাটির প্রয়োজন হবে তার চেয়ে বেশি জমি আপনার নয়।'

এই কথা বলে কল্যাণ আলেকজাণ্ডারের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বেঁচে থাকার বাসনা আর তাঁর নেই। স্বেচ্ছামৃত্যুই তিনি কামনা করেন। প্রথমে আলেকজাণ্ডার তাঁর কথায় বিশ্বাস করতে চাইলেন না। কিন্তু তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখে তিনি সম্মতি দিলেন। একটা সুন্দর ঘোড়া আর বহু স্বর্ণপাত্র তাঁকে উপহার দিলেন তাঁর চিতায় উৎসর্গ করবার জন্য।

পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে চলেছেন কল্যাণ। জীবনে কোনদিন কোন পার্থিব জিনিসের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না তাঁর। তাই তিনি কোন উপহারই গ্রহণ করলেন না। ঘোড়া আর স্বর্ণপাত্রগুলি তিনি দান করে দিলেন ম্যাসিডোনিয়ানদের মধ্যে।

চিতা সাজানো হল। এই চিতায় দেহত্যাগ করবেন ভারতের

যোগীবর কল্যাণ। দৃশ্য দেখার জন্য জনসমাগমও হয়েছে প্রচুর। তারা সবিস্ময়ে দেখল এক শীর্ণকায় তেজ-দীপ্ত যোগীকে চিতার ওপর শয়ন করতে। এই দৃশ্য আলেকজাণ্ডারও দেখলেন।

তিনি ভেরী বাজাতে আদেশ দিলেন আর হস্তীদের বৃংহনের মাধ্যমে তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানানো হল। আলেকজাণ্ডার কল্যাণকে তেজস্বী পুরুষ বলেই মনে করতেন। কল্যাণের মৃত্যুর পর গ্রীক সৈন্যেরা তাদের রক্ষাকবচ হারালো। তারা বুঝতে পারল কল্যাণের মৃত্যুতে তারা কম ক্ষতিগ্রস্ত হল না।

তোতা-কাহিনী

পাখিটার গলায় ছিল চুনির হার, পালক ছিল তার পান্নার মত সবুজ রংয়ের। ভারতের এক মহামান্য রাজা এই তোতাকে পাঠিয়েছিলেন রোমের বিখ্যাত সম্রাট অগস্টাসের কাছে। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত যখন তাঁর সামনে খাঁচার রেশমী ঢাকা উন্মোচন করেন, তখন পাখিটা অগস্টাসকে অভিনন্দন জানায়—'জয়তু সিজার, দেশের জনক'। এই ভারতীয় তোতাপাখির কাহিনী লিপিবদ্ধ করে লিভিয়া তাঁর এক চিঠিতে মন্তব্য করেন, শিশুর পক্ষে এই কথাগুলো বলা সম্ভব, কিন্তু একটা পাখির পক্ষে বলা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি আরও বলেন, এই কথাগুলোর অর্থ পাখিটার জানা নেই বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে কথা বলতে শিখিয়েছে, তার কৃতিত্বের তুলনা নেই।

প্রাচীন ভারতে শুকসারীদের কথা বলতে সযত্নে শিক্ষা দেওয়া হত। অভিজ্ঞ পক্ষী-শিক্ষকেরা এই কাজের ভার গ্রহণ করতেন। চৌষট্টি কলার মধ্যে এটাও ছিল একটি কলা। এই প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করি।

"ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে কোন কোন পক্ষী জাতির শিক্ষায় সমধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। এবং এই শিক্ষার প্রভাবে তাহাদের মধ্যে অনেকে অতি স্ফুটবাক এবং বিলক্ষণ মেধাশক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ রাজস্থানে অনেক পোষিত শুকপাখীকে ঠিক মানুষের মত কথা বলিতে শুনা যায়—বাঙলাতেও অনেক কাকাতুয়া টিয়া এবং ময়না পাখী মানুষের কথার অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে। পূর্বকালে যখন ভারতবর্ষে অন্ন ছিল সুখ ছিল, ঘরে ঘরে পাখী পোষা এবং পাখী পড়ান ছিল—তখন যে রাজরাজড়াদিগের গৃহে অতি সুশিক্ষিত পক্ষীসকল থাকিত, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সেই সময়ে সেইরূপ পক্ষীসকল

ছিল বলিয়াই তাহাদিগের জাতিস্মরতা প্রভৃতি অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে শ্লোক আখ্যায়িকা এবং পুস্তকাদি রচিত হইয়া গিয়াছে।"

প্রাচীন ভারতের গল্পে নাটো কাব্যে লোককথায় 'শুকসারী'দের বহু বিচিত্র কাহিনী পাওয়া যায়। 'শুকসপ্ততির' কথাই বলা যাক। পাখিটা ছিল অত্যন্ত চতুর। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর বিপথগামিনী হওয়ার সুযোগ দেখা দেয়। কিন্তু এই শুকই প্রতি রাত্রে একটির পর একটি চিত্তাকর্ষক গল্প বলে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটকেও তো শুকপাখীর কথা আছে—তার সামনে কেউ কোন কথা বললে সে শোনামাত্র আয়ত্ত করে ফেলত আর সেই সব কথা হুবহু আবৃত্তি করত। অন্য এক কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক নয়। রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সকল প্রেম-কথা হত গৃহপালিত শুকপাখী তাই শুনে সকালে গুরুজনদের কাছে হুবহু আবৃত্তি করত। পাখীটা সৃষ্টি করেছিল এক জটিল সমস্যা। স্ত্রীর মুখ লাল হত লজ্জায়। তাই লজ্জাশীলা বধূ তার পদ্মরাগ-খচিত কানের অলংকার পাখীটার চঞ্চুতে ঢুকিয়ে তার কথা বলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। বিদ্‌পাইয়ের গল্প-সংগ্রহেও আছে শুকের কাহিনী। মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-কাহিনী থেকে জানা যায়, রাজার কাছে কাছে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াত শিক্ষিত তোতাপাখিরা।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও শুকসারীর কথা আছে। "শুক সঙ্গে শাস্ত্র কথা কহে কুতূহলে," লিখেছেন কবি ভারতচন্দ্র:

কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।
ফিরে আসে ল'য়ে গেলা আপনার শারী॥
শারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বেহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ॥

রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর লাইন মনে পড়ছে: 'সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারি।' তাঁর 'তোতা-কাহিনী'র তো তুলনা নেই।

বাংলা দেশে পাখি পোষার শখ আজও আছে। কাকাতুয়া,

ম্যাকাও, ময়না, টিয়া, চন্দনা প্রভৃতি পাখির কণ্ঠস্বর অনেক বাড়িতেই শোনা যায়। শোনা যায় তাদের শেখানো সব বুলি—'রাধা রাধা', 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির কাকাতুয়ার কথা অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন "—বাবা মহাশয়ের ছিল পোষা একটি কাকাতুয়া গোলাপী রংয়ের। বারান্দায় দেওয়ালে টাঙানো হরিণের শিংয়ের উপর বসে থাকে, কি সুন্দর লাগে দেখতে। সকাল বেলায় মা পান সাজেন, মার কাছে গিয়ে পানের বোঁটা খায়। ছোট পিসিমার কাছে ছোলা খায়। আবার এসে শিংয়ের উপর উঠে বসে।

...তার ডানার তলায় তলায় বাবামশায় নিজের হাতে পাউডার মাখান। পাউডার মেখে সে মেমসাহেব হয়ে ঝুঁটি বাগিয়ে বসে থাকে। গুমোর কি তার...।"

শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীর নানা দেশে প্যারট জাতীয় পাখির অনেক কথা ও কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সেই সব কাহিনীর কয়েকটি বলছি এখানে।

স্যালবার্গ গির্জার অধ্যক্ষ ছিলেন হ্যানিকল। এই ভদ্রলোক সকাল ৯টা থেকে ১০টা এবং রাত্রি ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত তাঁর এক তোতাকে শিক্ষা দিতেন। এই সযত্ন শিক্ষার ফলে পাখিটার অনেক কথা বলার শক্তি জন্মায়। এই পাখিকে গত শতাব্দীতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখেছেন এবং তাঁদের মন্তব্যও লিখে গেছেন।

একদিন এক ভদ্রলোক ঘরে ঢোকা মাত্র পাখিটা কর্কশকণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করল, 'কোথা থেকে আসছেন মশায়?' প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারল আগন্তুক কোন নগণ্য ব্যক্তি নয়, একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তাই ক্ষমাপ্রার্থীর সুরে বলল, 'মাপ করবেন, শ্রদ্ধেয় মহাশয়, আমি আপনাকে একটা পাখি বলে মনে করেছিলাম।' এই তোতার সম্বন্ধে আরও জানা যায়, এ নাকি কথাবার্তায় অংশ গ্রহণ করত এবং এক এক সময় এমন অনর্গল বকে যেত যে, তাকে জোর করে থামাতে হত। অনেক সময় নানা রোমাঞ্চকর বিষয় কল্পনা

করে নিজে নিজেই কথা বলে যেত। যেমন—'মারবে? মারবে না কি?' 'ও, তুই একটা রাসকেল!' 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো জগতের রীতি'...ইত্যাদি। আবার কোন অপেরার খানিকটা গানও আবৃত্তি করতে পারত। এ পাখিটা অবশ্য 'রাসকেল' বলত, কিন্তু এমন অনেক প্যারট আছে যারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতেও অভ্যস্ত।

অন্য একটি প্যারটের কথা বলি। এ পাখিটা ছিল ধূসর রংয়ের, কিন্তু লেজটা ছিল লাল। প্যারীর অ্যানথ্রোপলজিকেল সোসাইটির সভ্য নিকাইসের পাখি। বয়স তখন হয়েছিল প্রায় ৫০। রাস্তার শব্দ, চিৎকার কথাবার্তা যা কিছু সে শুনতো তাই হুবহু অনুকরণ করত। প্যারী থেকে তাকে একবার কিছু সময়ের জন্য এক গ্রামে পাঠান হয়। সে যখন ফিরে আসে প্যারীতে তখন সে অনেক কিছুই শিখে আসে—প্যাঁচার ডাক, মোরগের ডাক, নানা পশুপাখির ডাক। প্রায় ২৫ বছর আগে এই পাখিটা একটা শূকর হত্যার দৃশ্য দেখেছিল। কিন্তু এতকাল পরেও সে তার কণ্ঠস্বরের নানা ভঙ্গীতে সেই ঘটনার হুবহু বর্ণনা দিতে পারত। এ আবার কথাবার্তা শুনে কখনও 'আহা' বলে, কখনও বা 'ও, ও' বলে তার মতামত জানাত। আবার বাড়িতে যখন হাসির ফোয়ারা ছুটতো তখন সে হাসিতে যোগ দিত, যদিও সে এই হাসির কারণ বুঝতে পারত না।

কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে বাড়ির গৃহকর্ত্রীকে সে ডাকত 'মেরি, মেরি' বলে। যদি তার ডাকে মেরি সাড়া না দিত তাহলে অধীর বিরক্তির সুরে চিৎকার করে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলত। একদিন হঠাৎ ঘরে আগুন ধরে যায়, ঘরটা ধোঁয়াতে ভরে ওঠে। তখন পাখিটার করুণ কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'মেরি, ও মেরি।' এ আবার খুব হিসেবী ছিল। দিনের বেলা খেতে দিলে রাত্রের জন্য কিছু খাবার সরিয়ে রাখত।

আমেরিকার কলম্বাস শহরের সিটি বুলেটিন পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু দেখা করতে এসেছেন। দরজার কড়া নাড়ছেন। ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।' ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'দরজা যে বন্ধ'। আবার ভেতর থেকে জানানো হোল, 'ভেতরে আসুন'। বিরক্তির সুরে ভদ্রলোক আবার বললেন, 'দরজা যে বন্ধ'। ব্যাপার দেখে পাশের বাড়ির এক মহিলা জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, বাড়িতে এখন কেউ নেই; আপনি প্যারটের সঙ্গে কথা বলছেন।

থিওফিল গতিয়ারের বিড়াল-প্রীতি ছিল অসাধারণ। তাঁর এক বিড়ালের নামকরণ করেছিলেন, 'ম্যাডাম থিওফিল।' এণ্ড্রু ল্যাংয়ের গল্প-সংগ্রহে এর কাহিনী আছে। একদিন গতিয়ারের এক বন্ধু কয়েকদিনের জন্য তাঁর প্রিয় প্যারটটি তাঁর বাড়িতে রেখে যান। ম্যাডাম থিওফিল কথনও কোন প্যারট দেখেনি। অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখে তার ধারণা হল, ওটা নিশ্চয়ই সবুজ রঙের মুরগীর ছানা আর খেতে লাগবে খুব মিষ্টি। তাই বিড়ালটার নোলায় জল এল। বিড়ালটার মতিগতি যে হিংসাত্মক তা পাখিটা বেশ বুঝতে পারল।

মুহূর্ত মধ্যেই বিড়ালটা একেবারে প্যারটের কাছে এসে হাজির। পাখিটা বুঝতে পারল বেরালটা এবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই গম্ভীর স্বরে বলল, 'জ্যাকি, আজ ভাল প্রাতরাশ জুটেছে তো? কথাগুলো শুনে বেরালটা আঁৎকে উঠলো। যতখানি এগিয়ে এসেছিল, ততখানি আবার পিছিয়ে গেল। পাখিটা আবার বলল, 'কি খেয়েছ, সিদ্ধ মাংস?' বেরালটা ভাবল, 'এটা তো মুরগী বাচ্চা নয়, এটা তো মানুষ।' তারপর সেখান থেকে দে ছুট।

বছর পনের আগে এক বিখ্যাত ইংরেজি সাময়িকপত্রে এক অদ্ভুত ময়না পাখির বিবরণ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই পাখির কথাই বলছি এখানে। মালয়ের জঙ্গল থেকে কার্ভেথ ওয়েলেস একটা

কালো রং-এর ময়না পাখিকে আমেরিকায় নিয়ে যান। তার নাম রাখেন 'র‍্যাফলস্'। এই পাখিকে তিনি 'হ্যালো ডার্লিং' বলতে শিখিয়েছিলেন। এমন সুস্পষ্ট নিখুঁত স্বরে বলতে পারত যে, ভদ্রলোকের প্রায়ই ভুল হত, তাঁর স্ত্রী তাঁকে ডাকছেন, না প্যারটটা তাঁকে ডাকছে।

একবার এক মজার ঘটনা ঘটে। সারা চার্চিল তখন নিউ ইয়র্কে কার্ভেথ ওয়েলেসের ফ্ল্যাটে আছেন। এক ভদ্রলোক একদিন সারাকে ফোন করল, 'আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাই, তিনি কি এখন ওখানে আছেন?' সারা উত্তর দিল, 'না, তিনি নেই, ক্যালিফোর্নিয়া গেছেন।' ফোনের কাছেই ছিল প্যারটটা, সে ঠিক এই সময়ে বলে উঠল, 'হ্যালো ডার্লিং'। ভদ্রলোকের কানে গেল কেউ বেশ মিষ্টি গলায় সারাকে ডার্লিং বলে সম্বোধন করছে। 'বাড়িতে যদি তোমার স্বামী নেই, তবে কে তোমার সঙ্গে কথা বলছে?'---তিনি প্রশ্ন করলেন। সারা তখন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, 'ও একটা প্যারট, নাম র‍্যাফলস।' সঙ্গে সঙ্গে সারা এই পাখিকে দেখে যাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান।

র‍্যাফলস আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত 'দি স্টার-স্প্যাংগল্ড ব্যানার'-এর খানিকটা অংশ গাইতে পারত। তাকে দেখতে আসতো অনেকেই, এমন কি হলিউডের চিত্রতারকারাও। ওয়াল্ট ডিস্‌নি তো এর সম্মানে একটা ভোজের আয়োজন করেন। সংবাদপত্র, রেডিও, অরকেস্ট্রা প্রভৃতির মাধ্যমে র‍্যাফলসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা আমেরিকায়। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় হাসপাতালে গিয়ে কথা বলে, গান গেয়ে আহত সৈনিকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল সে।

এক হাসপাতালে একটি বালক মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বালকের নাকে লাগান হয়েছে একটা বড় রবারের নল, দেখতে ঠিক সাপের মত। র‍্যাফলসের নাম বালকটিও শুনেছিল, তাই তাকে দেখার জন্য তার মায়ের কাছে আব্দার করল। সকলেই আশঙ্কা করেছিল লম্বা রবারের নাক দেখলে পাখিটা সাপ মনে করে চিৎকার করে

পালিয়ে যাবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! র‍্যাফলস্ ঠিক বালকের রোগশয্যাতেই এসে বসল। তার কানের কাছে গিয়ে সুমধুর কণ্ঠে বলল, 'হ্যালো ডালিং'। আর গাইল জাতীয় সঙ্গীত। বালকটির পাণ্ডুর মুখে ক্ষণিকের জন্য হাসি ফুটে উঠল।

দক্ষিণ আমেরিকার এটুরিয়ান উপজাতি এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের সঙ্গে তাদের ভাষাও চিরকালের মত লুপ্ত হয়। একটা প্যারট কিন্তু বেঁচেছিল আর সে একটা গাছের ওপর বসে সেই উপজাতির ভাষায় কয়েকটি কথা বলত। এই কাহিনীর উল্লেখ করেছেন হোম্‌বোলড্‌ট। অন্য একটি ঘটনার কথা বলি। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনের লুণ্ঠনকারী দস্যুরা ডেরিয়েন যোজকের কাছের একটা গ্রাম আক্রমণ করে। এই সময়ে কয়েকটা প্যারট এই গ্রামের গাছের ওপর বসেছিল। তারা শত্রুদের আগমন-বার্তা ঘোষণা করে। ফলে গ্রামবাসীরা পলায়ন করতে সমর্থ হয়।

অতীতের কথা অনেক তো বলা হল। 'যুগান্তরে' প্রকাশিত (২৬শে জুন, ১৯৬৫) রয়টারের একটি সংবাদও কম চিত্তাকর্ষক নয়। এই প্রসঙ্গে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছি: "তিন ঠগ দক্ষিণ লণ্ডনের এক বাড়িতে ঢোকে। ৭২ ও ৫৬ বছরের দুই বৃদ্ধা ভগ্নীকে কাবু করে সর্বস্ব অপহরণের চেষ্টা করছিল। কিন্তু এক তোতার পুরুষ কণ্ঠের হুঙ্কারে তারা শেষ মুহূর্তে ভয়ে পালিয়ে যায়।

ধস্তাধস্তিতে দুই ভগ্নী যখন পর্যুদস্ত সেই সময় রান্নাঘর থেকে হঠাৎ ভেসে আসে তোতার হুঙ্কার—কি হচ্ছে কি, সাবধান! শোনামাত্র ভয়ার্ত তিনজন ঠগই সব ফেলে পালিয়ে যায়। তাদের দুজন ধরা পড়েছে!"

প্যারট বললে এক শ্রেণীর পাখিকেই বোঝায়। পক্ষী-বিজ্ঞানীরা ৩০০-র বেশী পাখিকে এই শ্রেণীভুক্ত করেছেন। এদের মধ্যে কাকাতুয়া, ম্যাকাও, টিয়া, লোরি, লোরিকিট, বুলফিঞ্চ প্রভৃতি প্যারট শ্রেণীর অন্তর্গত। এই পাখিদের মধ্যে নিউগিনির তিন

ইঞ্চি বামন প্যারট আর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার তিন ফুট লম্বা প্যারট উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম আফ্রিকার ধূসর রং-এর প্যারট এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার সবুজ রং-এর প্যারট ট্রেণিং দিলে খুব শীগ্‌গির কথা বলতে পারে।

কিন্তু প্যারটেরা কতগুলো শব্দ শিখতে পারে? বলতে পারে কটা বাক্য? মনে রাখতে পারে কত কথা? এ বিষয়ে পক্ষী-বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। এরা বলেন উপযুক্ত শিক্ষা দিলে এরা একশতেরও বেশী শব্দ বলতে পারে। কিন্তু যেমনই শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন প্যারটদের সকল উক্তিই সংক্ষিপ্ত বা অসংলগ্ন বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এক ফরাসী লেখক বলেন, তিনি একবার এক প্যারটকে গোটা 'লর্ডস প্রেয়ার' আবৃত্তি করতে শুনেছিলেন। জে এম বিচষ্টিন লিখেছেন, তিনি একবার একটা ধূসর রং-এর প্যারটকে 'অ্যাপসলস্ ক্রীড' নির্ভুলভাবে মুখস্থ বলতে শুনেছিলেন এবং সেই জন্য এক কার্ডিনেল একে একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন। ব্রেহম ও লেসলি বলেন, একটা আমেজন প্যারট পঞ্চাশ থেকে একশত শব্দ স্পষ্টভাবে বলতে শিখেছিল। হুকেনাস্ বলেন, কয়েক দিন ট্রেনিং দেবার পর এই জাতীয় একটা পাখি দশ পর্যন্ত গুণতে পারত। তিনি আরও বলেন, একটা প্যারট কেউ বাড়ি থেকে চলে গেলে তাকে 'অ্যাডিউ' বলে বিদায় সম্ভাষণ জানাত। এমন কি ঘরে যদি কোন অতিথি থাকত যাকে পাখিটা পছন্দ করত না তাকেও 'অ্যাডিউ' বলে বিদায় দিতে চাইত।

প্যারট জাতীয় পাখি ছাড়া ময়না, কাক, ম্যাগপাই, নীল জে, থ্রাস্ প্রভৃতি পাখিরাও ট্রেনিং দিলে মানুষের মত কণ্ঠস্বর অনুকরণ করতে পারে। নিউইয়র্কের শিশুদের এক চিড়িয়াখানায় ডেকন নামে এক কাক আছে। তাকে বলা হয় সরকারী অভ্যর্থনাকারী। শিশুরা চিড়িয়াখানায় এলে পাখিটা তাদের 'হ্যালো' বলে অভ্যর্থনা জানায়।

সংখ্যাপ্রীতি : সংখ্যাভীতি

সংখ্যার ব্যবহার শুধু অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গ্রাম, শহর, ব্যক্তি এ-সবের নামকরণেও সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। ভাষা, ধর্ম, আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেও তো সংখ্যার ছড়াছড়ি। জীবনের নানা প্রয়োজনে সংখ্যার ব্যবহার অপরিহার্য। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সংখ্যার দান অপরিমেয়। পিথাগোরাস ও তাঁর শিষ্যরা সংখ্যার গুণাগুণ সম্বন্ধে বহুকাল পূর্বে অনেক কথাই বলে গেছেন। এমন কি কোন সংখ্যাটি মানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে, কোন সংখ্যাটি শুভ বা অশুভ অথবা মানুষের মনে প্রীতি বা ভীতির উদ্রেক করে, এ-সব নিয়েও নানা দেশে অনেক কাহিনী, অনেক রহস্য জমা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। অসংখ্য কুসংস্কারেরও উৎপত্তি হয়েছে এই সংখ্যাকেই আশ্রয় করে।

মানুষের মনে কোন বিশেষ ধারণা বা কুসংস্কার বাসা বাঁধলে তাকে তাড়ানো সহজসাধ্য হয় না। বহুক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেন না। আজও দেখা যায় কেউ কেউ একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তিনজনে সিগারেট ধরাতে চান না বা তিনটে জিনিস দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। দান্তে নাকি একই কলমে তিনবার তাঁর রচনা সংশোধন করতেন না। আবার ৯ সংখ্যাটির ওপর তো তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। এই সংখ্যাটি বিশেষ রহস্যময় ও অর্থবহ বলেই তাঁর মনে হয়েছিল, কারণ বিয়েত্রিচের সঙ্গে এক উৎসবের দিনে তাঁর প্রথম যখন দেখা হয় তখন তার বয়স ছিল ৯, আর দান্তের বয়সও ছিল ৯। দ্বিতীয়বার তিনি এই লাস্যময়ী কিশোরীকে দেখেন ঠিক ৯ বছর পরে।

শুভকর্মে আমরা ১০০ টাকার পরিবর্তে ১০১ টাকা দিতে চাই,

১০০ বছরের লিস্ট না দিয়ে ৯৯ বছরের লিস্ট দিই, আর বলি 'বাহাত্তুরে,' 'নিরানব্বইয়ের ধাক্কা' ইত্যাদি।

তাস খেলার ব্যাপারেও অনেক কুসংস্কার আছে। চিড়িতনের ছবি নাকি খুব শুভ, একে পাশ্চাত্য দেশে বলা হয় তাসের রক্ষাকবচ। কিন্তু চিড়িতনের ৪ হচ্ছে সর্বনেশে। যার হাতে এটা থাকবে তার নাকি জয়লাভের আশা খুব কম। মধ্যযুগের ইউরোপে এই তাসকে বলা হত 'শয়তানের শয্যা'। এই সব ধারণার কোন যুক্তিনির্ভর কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

*　　　*　　　*

যুগ্ম, অযুগ্ম সংখ্যা নিয়েও অনেক কথা, অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে। পিথাগোরাস তো বিজোড় সংখ্যাকে শুভ বলেই মনে করতেন। সেকালে চীনদেশে বিজোড় সংখ্যাকে স্বর্গীয় সংখ্যা বলে গণ্য করা হত আর তারা সংখ্যাকে স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করত। ১, ৩, ৫, ৭, ৯ সংখ্যাগুলি জোড় সংখ্যার চেয়েও যে বেশী মঙ্গলদায়ক তা পাশ্চাত্য দেশের অনেকেই মনে করত। সেক্সপীয়র তাঁর "মেরি ওয়াইভস্ অব উইণ্ডসর" নাটকে বলেছেন—

"There is divinity in odd numbers, either in nativity, chance, or death."

অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, ভাগ্য সব ক্ষেত্রেই বিজোড় সংখ্যার দেবত্ব স্বীকার্য।

সেকালে ইংলণ্ডের লোকেরা ফেব্রুয়ারী মাসের ৬, ৭, ১৮ তারিখ-গুলো বিবাহের পক্ষে অকল্যাণকর বলে মনে করত, তাই ঐ-সব দিনে বিবাহ অনুষ্ঠিত হত না। জুন মাসের ৩, ১৫ এবং অক্টোবর মাসের ৬ তারিখ বিবাহের পক্ষে বিশেষ অশুভ ছিল। সারা বছরের মধ্যে ৫ঠা জুন ও ৯ই অক্টোবর শ্রেষ্ঠ দিন বলে গণ্য হত। স্যার জন সিনক্লেয়ার বলেন, সপ্তাহের যেদিন ১৪ই মে পড়ে সেদিনটা এতই

অশুভ যে স্কটল্যাণ্ডের লোকেরা কেউই বিবাহ তো করেই না, কোন ব্যবসাও আরম্ভ করে না ঐ দিন।

কিন্তু কেন এত বাছবিচার? কেন এই মাস, দিন, তারিখের প্রতি মানুষের এত প্রীতি এত ভীতি? অনেকেরই বিশ্বাস, এ-সব নিছক কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়, যা মানুষের মনে জগদ্দল পাথরের মত দীর্ঘকাল ধরে চেপে বসে আছে।

সংখ্যা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের মতে ইংরেজ রাজাদের জীবনকে ২ সংখ্যাটি বিড়ম্বিত করেছে, ভাগাহত করেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা হয় দ্বিতীয় এথেলরেড ছিলেন অপদার্থ রাজা, তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। দ্বিতীয় হ্যারোল্ড হেস্টিংসে নিহত হন, দ্বিতীয় উইলিয়ম নিউ ফরেস্টে গুলিবিদ্ধ হন, দ্বিতীয় হেনরীকে জীবনের শেষাঙ্কে অকৃতজ্ঞ পুত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়, দ্বিতীয় এডওয়ার্ডকে বার্কলি দুর্গে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, দ্বিতীয় রিচার্ড সিংহাসনচ্যুত হন, দ্বিতীয় চার্লস নির্বাসিত হন আর দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। পিথাগোরাস ১ সংখ্যাটিকে সুনজরে দেখেননি। একে তিনি 'diversity', 'disorder', 'principle of strife and evil' বলে মনে করতেন।

৩-এর মধ্যে রয়েছে আদ্য, মধ্য, অন্ত; জন্ম, জীবন, মৃত্যু। তাই পিথাগোরাস এই সংখ্যাটিকে perfect harmony বলেছেন। সকল দেশের পুরাণে সাহিত্যে ইতিহাসে তিন সংখ্যাবাচক বহু শব্দই পাওয়া যায়ঃ আমরা বলি ত্রিকাল, ত্রিলোক, ত্রিমূর্তি, ত্রিকূল, ত্রিগুণ, ত্রিকোণ, ত্রিদণ্ড, ত্রিতন্ত্রী, ত্রিদেব, ত্রিবর্গ, ত্রিপিটক, ত্রিফলা ইত্যাদি। শিবের নাম—ত্রিপুরারি, ত্রিলোচন, ত্রিনেত্র, ত্র্যম্বক, ত্রিশূলী। অবশ্য একদিনে তিন তিথির সহযোগে ত্র্যহস্পর্শ ঘটলে আমাদের দেশে কেউ কেউ যাত্রা করেন না। আর ভাদ্র মাসের প্রথম দিনটি তো শুভ নয়—এইদিন কোথাও গেলে অগস্ত্য যাত্রা করা হয়।

প্রাচীন মিশর ও গ্রীক দেশের অধিবাসীরা ৫ সংখ্যাটিকে শুভ মনে করত। অপদেবতাদের বা অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা দরজার ওপর এই সংখ্যাটিকে চিহ্নিত করত। রোমানদের বিবাহ অনুষ্ঠানে পাঁচটি দীপ জ্বালা, এক সঙ্গে পাঁচটি অতিথিকে স্বাগত জানান প্রভৃতির রীতি ছিল। ইহুদীদেরও এই সংখ্যার প্রতি কম আকর্ষণ ছিল না। তারাও পুরোহিতদের পাঁচটি উপহার দিত, ক্যাম্পে পাঁচ প্রকার খাবারের ব্যবস্থা করত। এমনকি গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে এই সংখ্যাটিকে মাদুলীরূপে ব্যবহার করার প্রথাও প্রচলিত ছিল। আর মানুষ তো প্রথম গুণতে শিখেছিল পাঁচটি আঙুলের সাহায্যেই। আমরাও তো পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, পঞ্চপাত্র, পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চকোষ, পঞ্চতপাঃ, পঞ্চবাণ, পঞ্চযজ্ঞ, পঞ্চমুদ্রা, পঞ্চানন, পঞ্চশীল প্রভৃতি কত কথাই না ব্যবহার করি। এই প্রসঙ্গে pentacle বা পঞ্চ রেখাচিত্রর কথা বলা যেতে পারে। এশিয়ার নানা স্থানে এক সময় এই রেখাচিত্রের প্রচলন ছিল। এটা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত ডাইনীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য। পিথাগোরাস একে মনে করতেন স্বাস্থ্যের প্রতীক চিহ্ন এবং ইহুদীরা মনে করত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। মধ্যযুগে খৃষ্টানেরাও শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই চিত্ররেখা ব্যবহার করত।

* * *

সপ্তম পুত্রের সপ্তম পুত্র অসাধারণ প্রতিভার উত্তরাধিকারী হয় বলে পাশ্চাত্ত্য দেশে একটা ধারণা চলে আসছে বহু দিন ধরে। মধ্যযুগে ইউরোপের লোকেরা বিশ্বাস করত যে এইরূপ সন্তান তাদের করস্পর্শের সাহায্যে দুরারোগ্য ব্যাধি পর্যন্ত সারাতে পারত, এমন কি এরা মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বলতে পারত। ৭ সংখ্যাটি হিব্রু আরব অ্যাশীরীয় লোকেদের কাছে পবিত্র সংখ্যা বলে গণ্য হত। বাইবেলেও সাত সংখ্যাটির বহু উল্লেখ দেখা যায়। আমরা

বলি সপ্তর্ষি, সপ্তস্বর, সপ্তসাগর, সপ্তাশ্ব, সপ্তগ্রাম, সপ্তজিহ্বা, সপ্তদ্বীপ, সপ্তপদী ইত্যাদি।

৭ সংখ্যাটির সঙ্গে অনেক ব্যাধির সংযোগও লক্ষ্য করা যায়। ৭, ১৪, ২১ এই সব দিনে রোগের হ্রাস বৃদ্ধির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। একে এই জন্য বলা হয় 'Climacteric number in all diseases!' অন্তত পিথাগোরাস তাই বলেছেন। এই সংখ্যাকে 'মেডিকেল নাম্বার'ও বলা হয়।

মানুষের জীবনে চরম সংকটকাল দেখা দেয় কোন বয়সে? ৬৩ (৭ × ৯), ৮১ না ৮৪ (৭ × ১১) বছরে? এ সম্বন্ধে অবশ্য নানা মুনির নানা মত আছে। সাধারণত ৬৩ বছর বয়সকেই 'গ্র্যাণ্ড ক্লাইমেক্‌ট্রিক' বা চরম সংকটকাল বলা হয়। এই বয়সে কেউ যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাকে বাঁচানো দুঃসাধ্য হয়। রোম সম্রাট অগস্টাস ৬৩ বছর পার হবার পর তাঁর জীবনের চরম সংকটকাল অতিক্রম করতে পেরেছিলেন বলে কি আনন্দোচ্ছ্বাসই না প্রকাশ করেন। রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসের (মৃত্যু খ্রীঃ অব্দ ৫৪) কথাও বলি। বারবিলাস নামে এক জ্যোতিষী তাঁর কোষ্ঠী বিচার করে বলেছিলেন, তিনি ৬৩ বছর, ৬৩ দিন, ৬৩ প্রহর এবং ৬৩ ঘণ্টা বাঁচবেন। অন্য এক জ্যোতিষী বলেছিলেন যে মানুষের জীবনে ৭ আর ৯ এর এমন গুণফল অত্যন্ত বিরল। সোরারী বলেছেন ৮১ বছরই হচ্ছে জীবনের চরম সংকটকাল, কেননা এই বয়সেই প্লেটো, ডাইওজিনিস প্রভৃতি বহু প্রখ্যাত মনীষীর জীবনাবসান ঘটে। অবশ্য ৮৪ (৭ × ১২) বছর যে চরম সংকটকাল এ কথাও কেউ কেউ বলেন।

প্রাচীন রোমের লোকেরা শুভাশুভ দিন সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল। রোম সম্রাট প্রথম ক্লডিয়াস তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখে গেছেন যে ১৬ই জুলাই কেউ যুদ্ধ করে না, বিবাহ করে না, এমন কি বাড়ি পর্যন্ত ক্রয় করে না। ক্লডিয়াসের ভ্রাতা জারমানিকাস্

১৭ সংখ্যাটিকে ভীষণ ভয় করতেন। আর ভয় করতেন মধ্যরাত্রে মোরগের ডাককে। এই ১৭ সংখ্যাটি মৃত্যুর ঠিক পূর্বে তাঁর মনে এক চরম বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

চিতোর দুর্গের পতনের পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শত শত বীর রাজপুতের যে সকল উপবীত আকবর সংগ্রহ করেছিলেন তার ওজন ছিল ৭৪॥ মণ (এক মণের ওজন ৮ পাউণ্ড)। এই হত্যালীলার করুণ স্মৃতি বহন করেছে এই অভিশপ্ত সংখ্যাটি। এই হচ্ছে জনপ্রবাদ। টড্ সাহেব বলেছেন:

"Marked on the banker's letter in Rajasthan it is the strangest of seals for the sin of the slaughter of Chitor is thereby invoked on all who violate a letter under the safeguard of this mysterious number."

গোপনীয় চিঠিপত্রের ওপর এই সংখ্যাটির ব্যবহার বাংলা দেশেও পূর্বে কিছু প্রচলিত ছিল। এখন বড় একটা চোখে পড়ে না। অবশ্য ৭৪॥ লেখার এই উৎপত্তির কথা জনশ্রুতিই, ইতিহাস নয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ভিন্ন মতের জন্য ভিনসেণ্ট স্মিথের মোগল সম্রাট আকবরের ইতিহাস দেখতে পারেন।

সংখ্যার অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে বহু কল্পনা বাক্‌বিতণ্ডা, সমালোচনা হয়েছে অতীতে। ৬৬৬ সংখ্যাটির কথাই বলি। বাইবেলের বুক্ অব রেভেলেসন-এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই সংখ্যাটির উল্লেখ আছে:

"Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast; for it is the number of a man, and his number is six hundred, three score and six."

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ৬৬৬ সংখ্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে অনেক পণ্ডিতই হিমসিম খেয়েছেন। আজও এটা রহস্যই থেকে গেছে। এর সমাধান হয়নি। পিটার বান্‌গাস্ ৬০০ পৃষ্ঠার

এক বই লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে এই সংখ্যাটি মার্টিন লুথারের নামের সাংকেতিক। মার্টিন লুথার অবশ্য এর জবাবে বলেছিলেন, পোপের রাজত্বকাল কত বছর চলবে তারই ভবিষ্যদ্বাণী এই সংখ্যাটি বহন করছে। অন্য একটি মত এই, রোম সম্রাট নিরোর নামের হিব্রু অক্ষরের সাংখ্যিক যোগফল হল ৬৬৬। এ সব ছাড়া ডাওক্লিসিয়ান, প্রথম নেপোলিয়ান, পঞ্চম পল প্রভৃতিদের নামও উল্লেখ করেছেন অনেকে। কেরো বলেন এই সংখ্যার মধ্যে আছে ৯টি গ্রহ যা মানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। তাঁর মতে ৬৬৬ হচ্ছে ৬+৬+৬=১৮; ১৮=১+৮=৯।

* * *

সব চেয়ে বেশী আলোচনা হয়েছে রহস্যময় ১৩ সংখ্যাটিকে কেন্দ্র করে। শুক্রবার যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কাজেই এই শুক্রবার যদি কোন মাসের ১৩ তারিখে পড়ে তাহলে তো কথাই নেই, সেটা খুবই অশুভ বলে ধরতে হবে। তুর্কীরা ১৩-কে এত ভয় করত যে তাদের কথাবার্তার মধ্যেও এই সংখ্যা কোন স্থান পেত না। লটারীতে নাকি ইতালীয়ানরা এই সংখ্যা ব্যবহারই করত না বা করে না। পারী নগরীর কোন বাড়ি এই সংখ্যায় চিহ্নিত হত না। ইউরোপে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে কেউ যদি ১৩ নম্বরের টিকেট কিনে সেই টিকেট নিয়ে প্রথমেই থিয়েটারে প্রবেশ করতে যেত তাহলে দ্বাররক্ষক তাকে ভেতরে না ঢুকতে দিয়ে অপেক্ষা করতে বলত। কারণ এই টিকেট-ধারী যদি প্রেক্ষাগৃহে প্রথমেই প্রবেশ করত তাহলে গোটাই নাকি মাটি হয়ে যেত। হোটেলের ১৩নং ঘরে কেউ বড় একটা ঢুকতে চায় না। যদি ঢুকতেই হয় তবে মনমরা হয়ে ঢোকে। ব্রিটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে ১৩ সংখ্যক সিটে নাকি কেউই প্রথমে এসে বসতে চায় না। সব সিট ভর্তি হয়ে গেলে তবেই এই সিটে বসে। ১৩ নম্বর নিয়ে এইরূপ নানা কথা, নানা কাহিনী, নানা সংস্কার প্রচলিত আছে পাশ্চাত্য দেশে।

১৩ সংখ্যাটি কেন অশুভ তা নিয়েও একাধিক কাহিনী, কিংবদন্তী আছে। স্ক্যানডিনেভিয়ার এক পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ : ১২ জন দেবতা এক ভোজে বসেছেন, এমন সময় অপদেবতা লকি প্রবেশ করল সেখানে। ভোজসভার সংখ্যা দাঁড়াল ১৩। ঘরে ঢুকেই শান্তির দেবতা বালডুরের সঙ্গে লকি বাধাল ঝগড়া আর একটা মিশলটোর তীর ছুঁড়ে বিদ্ধ করল তাকে। এছাড়া যীশুখ্রীষ্টের অন্তিম ভোজের কথাও স্মরণীয়। জুদাসকে নিয়ে এই ভোজে যোগ দিয়েছিল ১৩ জন। এই ঘটনা থেকেই নাকি ১৩ সংখ্যাটি অভিশপ্ত হয়েছে। ১৩ জন একত্রে আহার করতে বসলে এদের মধ্যে একজন এক বছরের মধ্যে মারা পড়বে, এই ধারণা আজও পাশ্চাত্য দেশ থেকে দূর হয়নি। কোন খৃষ্টমাস পার্টিতে আজও ১৩ জন আহার করে না।

এচ্ স্ট্যানলি লণ্ডনের 'প্রেডিকসান' পত্রিকায় লিখেছেন, 'খৃষ্টমাসের ভোজের দিন এক বিশপ সভাপতিত্ব করছেন, আমরা সকলে টেবিলে বসেছি, এমন সময় তিনি বলে উঠলেন, 'আরে করেছো কি? টেবিলে যে ১৩জন বসেছো। এটা চলবে না। এই তেরজনকে দু ভাগ করে নাও।'

ভিকটর হুগো নাকি একবার এক ভোজে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে ১২জন অতিথি উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি এঁদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে একজন ইডিয়ট আছে যে ১৩জন হবার ভয়ে বসতে চাইছে না।' তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, কে এই আহাম্মক। উত্তরে হুগো বলেন, কেন, মশায়, আমিই সেই ইডিয়ট!'

কাহিনী কিংবদন্তী ছাড়াও ইতিহাস, সাহিত্য ও সংবাদপত্রে ১৩ সংখ্যার বারংবার উল্লেখ দেখা যায়। এই সংখ্যাটি যে ভীষণ আনলাকি তা অনেকেই তাঁদের রচনার মধ্যেও মন্তব্য করেন। কবি বায়রণের পিতা জন বায়রণ (যাকে ম্যাড জ্যাক বলা হত) বিয়ে করেন মিস ক্যাথেরিন গর্ডনকে। বিয়ে করেন ১৩ই মে। একে মে মাস, তার ওপর আবার ১৩ তারিখ। এই দিনটিকে বায়রণের এক

জীবনীকার বলেছেন, অত্যন্ত অশুভ দিন। এই বিবাহ অবশ্য ট্র্যাজেডিতেই পরিণত হয়েছিল। কবি বায়রণও ১৩ই মার্চ হাউস অব লর্ডসের আসন গ্রহণ করেন। তিনি ১৩নং পিকাডেলি টেরেসে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বাস করেন। এখানে তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখকর ছিল না।

রাজা নবম চার্লসের ভ্রাতা তৃতীয় হেনরী (১৫৫১-১৫৮৯) ছিলেন ভেলয় রাজবংশের শেষ রাজা। অদ্ভুত ছিল তার জীবন। মেয়েদের পোশাক পরত, অসংখ্য কুকুর ছিল তার নিত্যসহচর আর বজ্রপাত হলেই ঘরের কোণে আশ্রয় নিত সে। মৃত্যুর পূর্বে সে বলেছিল, 'আমিই ত্রয়োদশ ভেলয় এবং শেষ রাজা। লোকে বলে ১৩ সংখ্যাটা অশুভ। আজ ১৩ বছর হল আমি পারীতে রাজা হয়ে এসেছি। হায় ভগবান! সব শেষ হয়ে গেল।' ছুরিকাঘাতে এই রাজার জীবনাবসান ঘটে।

পোর্তুগাল রাজবংশের ইতিহাসেও সর্বনেশে ১৩-র দেখা মেলে। রাজা মান্যুয়েলের তিনটি বিবাহ—সবশুদ্ধ সন্তান সংখ্যা ১৩। স্পেন ও পোর্তুগালের এক ঐতিহাসিক বলেন, এই সংখ্যাটি তাঁর বংশের ওপর দীর্ঘকাল ধরে অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই বংশেরই ভাগ্যহত রাজা সেবাস্‌টিয়ান।

স্যার জন এভারেট মিলাইস ছিলেন গত শতাব্দীর এক বিখ্যাত চিত্রকর। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ম্যাথু আরনল্ডের সম্বর্ধনার জন্য তাঁর স্কটল্যাণ্ড নিবাসে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। একজন অতিথি টেবিলে ১৩জন উপবিষ্ট আছেন বলে শংকিত হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে কোন বিপদ ঘটতে পারে এই কথাই তিনি জানান। ম্যাথু আরনল্ড কিন্তু এই ব্যাপারটাকে নিছক একটা কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, "আমি ও আমার দুই বন্ধু (এডগার ডসন্ এবং ই. এস্) এক সঙ্গেই টেবিল থেকে

উঠবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের তিনজনের সুন্দর অটুট স্বাস্থ্য মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে পারবে।"

কিন্তু ঘটনা ঘটলো নিদারুণ। ম্যাথু আরনল্ড মারা গেলেন ছ মাস পরে। এর কিছুকাল পরে তাঁর বন্ধু ই. এস্-এরও জীবনান্ত ঘটলো পিস্তলের গুলীতে, আর এডগার ডসন জলমগ্ন হয়ে নিউগিনির কাছে মারা পড়লেন ১৮৬৬ সালে। এই হল কাহিনী, মিলাইসের জীবনী ও চিঠিপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৯ সালে।

এক লেখক কিন্তু স্পেক্টেটার পত্রিকায় (৭ই মার্চ ১৯০৮) মৃত্যুর তারিখগুলো যে ভুল তা দেখিয়ে দেন। ম্যাথু আরনল্ডের মৃত্যু হয় ১৮৮৮ সালে, আর ডসনের জাহাজ জলমগ্ন হয় ১৮৯০ সালে। এই প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেন, ১৩ সংখ্যাটি মানুষের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে সত্য ঘটনা কেউই বিশ্বাস করে না।

সমাজসেবীরাও ১৩কে নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছেন। কোন বয়সে ছেলেরা প্রথম সিগারেট খাওয়া শুরু করে? কোন বয়সে তারা কুসংসর্গে পড়ে বিগড়ে যায় বা পাপাসক্ত হয়? আমেরিকার অধ্যাপক ডেভিস্ বলেন, ১৩ বছর বয়সেই এই সব কুশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি দুই হাজার ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন, কখন তারা প্রথম সিগারেট ধরে। এদের মধ্যে শতকরা ৮৫জন বলে— 'তের বছরে'।

কিন্তু সত্যই কি ১৩ সংখ্যাটি অশুভ, সর্বনেশে, অকল্যাণকর? এটা কি দীর্ঘকালের কুসংস্কার, না এই ভীতির কোন যুক্তিনির্ভর কারণ আছে? কেনই বা পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা-দৃপ্ত অগণিত লোক আজও এই সংখ্যাটির প্রতি এত অপ্রসন্ন? ১৩ সংখ্যার পক্ষে ওকালতি করবার কি কোন যুক্তিই নেই?

এচ, জি. ওয়েলস তাঁর জীবনসায়াহ্নে ১৩নং হ্যানোভার টেরেসে বাস করতে আসেন। এই সংখ্যা সম্বন্ধে যে বহু প্রচলিত কুসংস্কার

আছে তা তাঁর অজানা ছিল না। তবে তিনি এই কুসংস্কারকে মোটেই গ্রাহ্য না করে, বরং চ্যালেঞ্জ করেই বাস করতে আসেন এই বাড়িতে। এখানে অবশ্য তাঁর জীবনে কোন বিপত্তি ঘটেনি, ১৩নং তাঁকে বিপন্ন করতে পারেনি। কেবলমাত্র তাঁর বাগানটার কোন গাছেই ফল ধরেনি। এর জন্য অবশ্য তিনি ১৩কে দায়ী করেননি, করেছিলেন, 'the bloody sycamore next door'.

বিশ্ববরেণ্য সুরস্রষ্টা রিচার্ড ওয়াগনারের জীবনে তো ১৩র ছড়াছড়ি। তাঁর জন্ম ১৮১৩ সালে। সংখ্যাগুলি যোগ করলে হয় ১৩। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি মারা যান। তাঁর রচনার সংখ্যাও ১৩। ১৩ বছর তিনি বিবাহিত জীবন যাপন করেন। আর রিচার্ড ওয়াগনার নামটিও তো ১৩ অক্ষরের।

আমেরিকায় তো ১৩র জয়জয়কার। প্রথম যখন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তো ১৩টি রাজ্য নিয়েই গঠিত হয়েছিল। এর ঈগল পাখীর ডানায় তো ১৩টি পালক আছে। মেক্সিকোর প্রাচীন অধিবাসীরাও ১৩ সংখ্যাটিকে শুভ বলে মনে করত।

বৌদ্ধশাস্ত্রেও ১৩ সংখ্যার একাধিক উল্লেখ দেখা যায়। শ্রমণদের বা প্রব্রজ্যাগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের ১৩টি আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহ করবার নির্দেশ দেওয়া হত। ইৎসিং তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে বলেছেন, ইহাই প্রচলিত নিয়ম এবং বুদ্ধের শিক্ষানুযায়ী এইগুলি ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক।

ধুতাঙ্গের সংখ্যাও ছিল ১৩। শয়ন, উপবেশন, আহার, বিহার, বস্ত্র-পরিধান, খাদ্য সংগ্রহ, ঔষধ, সেবন প্রভৃতি বিষয়ে অবশ্য পালনীয় ১৩টি নির্দেশ। আমরাও তো বলি সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশী। ১৩কে হিন্দু শাস্ত্রে অশুভ সংখ্যা বলে কেউই চিহ্নিত করেনি।

কাজেই ১৩ সংখ্যাটি যে অশুভ, সর্বনেশে তা কি করে সিদ্ধান্ত করা যাবে। এই সংখ্যাটি যে পাশ্চাত্য দেশের লোকেদের কাছে

অভিশপ্ত, অপাঙক্তেয় তার নির্ভরযোগ্য যুক্তি কোথায়? সংখ্যা-প্রীতি বা সংখ্যা-ভীতির মূলে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে কেউ যদি সেক্সপীয়রকে সাক্ষী মেনে বলেন, 'There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy' তাহলে তো আর কিছু বলারই থাকে না।

কাঞ্চনমরীচিকা

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যু হল। বিলাসী, অমিতব্যয়ী এই 'গ্র্যাণ্ড মনার্কে'র দীর্ঘ রাজত্বকালের অবসান ঘটল ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে। রেখে গেলেন তিনি শূন্যপ্রায় রাজকোষ, করভারপীড়িত প্রজা, দুর্নীতি-ভরা দেশ। ব্যবসা-বাণিজ্যের নাভিশ্বাস উঠলো, চারিদিকে সাধারণ মানুষের জীবনে নামল দুর্বিষহ দারিদ্র্যের দীর্ঘ কালো মেঘ।

এই রাজ্য পরিচালনার ভার নিলেন রিজেণ্ট, ডিউক অব অরলিয়েন্স। বিপর্যস্ত আর্থিক অবস্থা দেখে প্রমাদ গুণলেন তিনি। ঠিক এই সময়েই প্যারীতে উদয় হল এডিনবরার এক সুযোগসন্ধানী স্বর্ণকার-পুত্র, জন ল।

ল'য়ের জীবন বিচিত্র। লণ্ডনে এসে ল অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে মিশে বিশৃঙ্খল জীবন-যাপন করে বহু অর্থ উড়িয়ে দেয়। একজনকে হত্যা করে জেলেও কাটায় কিছু দিন। তারপর কৌশলে জেল থেকে পালিয়ে পাড়ি দেয় কন্টিনেন্টে। জুয়া খেলে ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টাও করে নানা জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অর্থনৈতিক জ্ঞানও সঞ্চয় করে সে।

রিজেণ্টের সঙ্গে জন ল'য়ের পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ফ্রান্সের আর্থিক দুর্গতি মোচনের জন্য রিজেণ্টের সামনে নানা অর্থকরী পরিকল্পনা তুলে ধরে সে। লয়ের পরিকল্পনা মনঃপূত হয় রিজেণ্টের। সাগ্রহে সোৎসাহে লকে সাহায্য করেন তিনি। রিজেণ্টের পৃষ্ঠ-পোষকতায় ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কয়েক লক্ষ লিভর মূলধন নিয়ে এক ডিসকাউণ্ট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হল। এক বছরের মধ্যে এই ব্যাঙ্কের নোটগুলো সোনা-রূপার চেয়েও বেশী মূল্যবান বলে লোকের ধারণা জন্মাল। রিজেণ্ট মনে করলেন, দেশের পক্ষে কাগজের

নোটই ভাল। ব্যাঙ্কের খ্যাতি ছড়াল সারা দেশে। সঙ্গে সঙ্গে ল একজন অর্থনীতিবিশারদ বলে গণ্য হল ফ্রান্সে।

এই সময়েই ল আর একটি পরিকল্পনা রিজেন্টের কাছে উপস্থাপিত করল। যুক্তি দিয়ে তাঁকে বোঝাল যে, আমেরিকার মিসিসিপি নদীর তীরে লুইসিয়ানা প্রদেশ স্বর্ণপ্রসূ। সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি বহু মূল্যবান ধাতুর খনি আছে। এই অঞ্চলে, বিপুল রত্নভাণ্ডার সঞ্চিত আছে এই প্রদেশে। খনি থেকে তুলতে হবে এই সব ধাতু।

রিজেন্টের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ১০০০০০,০০০ লিভর মূলধন নিয়ে গঠিত হল "কোম্পানী দ' অকসিডেন্ট"। ল-এর পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নিল। ১৭১৯ সালে এই কোম্পানীই পুনর্গঠিত হয়ে কোম্পানী অব দি ইণ্ডিস নাম ধারণ করল এবং ইষ্ট ইণ্ডিস্, চায়না, সাউথ সিজ ও ফ্রেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সর্বত্র অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার ক্ষমতাও পেল এই সংস্থা। হাজার হাজার শেয়ার ছাড়া হল বাজারে। বার্ষিক ১২০ পারসেন্ট ডিভিডেণ্ডের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

শেয়ারের চাহিদা ক্রমেই বাড়তে লাগল। হাজার হাজার নতুন শেয়ার ছাড়া হল বাজারে। লাভের লোভে সারা দেশে শেয়ার কেনার ধুম পড়ে গেল। শেয়ার চাই, আরও শেয়ার—সারা ফ্রান্সটাই যেন পাগল হয়ে গেল শেয়ার কেনার নেশায়। শেয়ারের যা আসল মূল্য তার দশগুণ, কুড়িগুণ, এমন কি চল্লিশগুণ বেশী দরে কেনা-বেচা চলল।

সম্ভ্রান্ত ডিউকেরা এলেন শেয়ার কিনতে, তাঁদের অর্ধাঙ্গিনীরাও এলেন একই উদ্দেশ্যে। শহরের সব অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক জমল এসে ল সাহেবের আঙিনায়। এমন কি গৃহভৃত্য, গয়লানী, চর্মকার—সকলেরই মিছিল লেগে গেল শেয়ার কেনার উগ্র নেশায়। কোলাহলে আর কলরবে ল-এর বাড়ি মুখর হয়ে উঠল। এমন কি ভীড়ের চাপে কারুর হাত-পা ভাঙল, কেউ বা হল পিষ্ট।

এই অপরিসর বাড়ি থেকে ল গিয়ে উঠলো প্লেসভার্ঁমে। কিন্তু এখানেও নিস্তার নেই তার, শেয়ার পাগলদের এখানেও বিপুল সমাগম হল, কোলাহল আর হট্টগোল এত বেড়ে উঠলো যে, অদূরের বিচারালয়ে জজেদের নির্বিঘ্নে শান্তিতে কাজ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। তাই বাধ্য হয়েই এখান থেকেও পাততাড়ি গুটোতে হল ল'কে।

এবার তিনি গিয়ে উঠলেন প্রশস্ত এক হোটেল, Hotel de Seissons-এ। এই হোটেল সংলগ্ন বাগানেই পুরাদমে চলতে লাগল শেয়ারের বেচা-কেনা, দালালি, ফাটকাবাজি। এখানে রাতারাতি বহু ষ্টল তৈরি হয়ে গেল, বিরাট একটা মেলা বা কার্নিভালের রূপ নিল এই জায়গাটা। শেয়ারের ফাটকাবাজি চলল পুরাদমে।

ইতিহাসে এই শেয়ার মেনিয়ার তুলনা নেই। ল'এর খ্যাতি প্রতিপত্তি এখন বিপুল। ধনী লোকেরা ঘুরতে লাগল তার পিছু পিছু। লয়ের একটা প্রসন্ন দৃষ্টি, একটা প্রতিশ্রুতির জন্য হাজার হাজার লোক তার উমেদারী করতে লাগল।

শেয়ারের এই ফাটকাবাজীকে কেন্দ্র করেই বহু কৌতুককর ঘটনাও ঘটে গেল। অনেকই এই মরশুমে নানা রকম ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিয়ে বেশ দু-পয়সা কামাল। এক চর্মকার দিনে ২০০ লিভর উপার্জন করতো একটা ডেস্ক ভাড়া দিয়ে এই সব দালালদের। একটা লোক যার পিঠের কুঁজটাই ছিল তার একমাত্র সম্বল, সেও এই মরশুমে কাজে লাগিয়েছিল তার বিকৃত অঙ্গটাকে। সে তার পিঠের কুঁজটাকেই দিত রাইটিং ডেস্করূপে দালালদের ব্যবহার করতে। কুঁজ ভাড়া খাটিয়ে দিনের পর দিন জীবিকা উপার্জন করত সে।

ল এখন মস্ত বড় লোক। তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা সহজসাধ্য নয়। এক মহিলাকে শেয়ার কেনার নেশায় পেয়ে বসল। কিন্তু বারংবার চেষ্টা করেও ল-এর সঙ্গে দেখা করতে

পারল না সে। শেষে মরিয়া হয়েই সে এক ফন্দি এঁটে ফেলল। ল যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তখন একটা অ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে। মহিলাটি তিন দিন গাড়ি হাঁকিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘোরাঘুরি করল, কিন্তু ল-এর সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেল না। শেষে একদিন দেখতে পেল লকে রাস্তায়। তাকে দেখেই সে তার গাড়ির চালককে বলল, "শিগগীর, শিগগীর এইখানেই গাড়ীটা উল্টে দাও।" নির্দেশ পাওয়া মাত্র কোচম্যান গাড়িকে ল-এর সামনেই উল্টে দিল। আর মহিলাটি গড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। 'কি হল', 'কি হল' বলতে বলতে ল এগিয়ে এল মহিলার কাছে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। হাজার হোক ল• তো মানুষ, তাই মহিলার এ বিপদ দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন তিনি। কিন্তু মহিলার তো সাহায্যের প্রয়োজন নেই— প্রয়োজন শেয়ারের। শেয়ারের জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করেছে জানতে পেরে ল তাকে সেদিন শেয়ার দিয়ে খুশী করেছিলেন।

আর একজন মহিলার কথা বলি। শেয়ার পাবার জন্য এও বেশ ফন্দি এঁটেছিল। একদিন এক বাড়িতে ডিনারে ল নিমন্ত্রিত হয়, কিন্তু মহিলার ভাগ্যে নিমন্ত্রণ জোটেনি এখানে। নিমন্ত্রণ পাবার জন্য চেষ্টাও সে কম করে নি। কিন্তু তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়নি। তাই যখন ঘরের ভেতর সবাই খানাপিনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় এই মহিলা তার গাড়ি হাঁকিয়ে ঐ বাড়ির দরজার কাছে হাজির হল। দরজার কাছে এসেই কোচম্যানকে 'আগুন' 'আগুন' বলে চীৎকার করতে নির্দেশ দিল। চীৎকার শুনে বাড়ির সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ল দেখল সেখানে কোন আগুনই নেই। এই সময়েই ঐ মহিলা ছুটে এল ল-এর দিকে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। মেয়েটির ফন্দি বুঝতে দেরী হল না ল-এর। তাই পেছনের দরজা দিয়ে ল সরে পড়ল সেই বাড়ি থেকে।

শেয়ার কেনাবেচার হিড়িকে প্যারীর ব্যবসা-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা দেয়। বহুমূল্যের মণি-মুক্তা, সৌখীন জিনিসপত্র, দুর্লভ চিত্র প্যারীতে আসে বিক্রির জন্য। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাসিতার স্রোত বয়ে যায় প্যারী নগরীতে। ২০০০,০০০ লিভর মুদ্রা ব্যয় করে রিজেন্ট ক্রয় করল এক হীরে। তার নামেই এই হীরের নামকরণ হয় রিজেন্ট। ফাটকাবাজিতে ভাগ্যোদয়ও হয় অনেকের ; বহু নিঃস্ব ব্যক্তিও রাতারাতি ধনী হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই শেয়ার মেনিয়া বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। দু বছরের মধ্যেই ল-এর পরিকল্পনায় ফাটল দেখা দেয়। ল ভালভাবেই জানত যে, এই সব শেয়ারের পেছনে যখন কোন সিকিউরিটি নেই, ধাতব মুদ্রা নেই, তখন একমাত্র লোকের বিশ্বাসের ওপরই তাকে নির্ভর করতে হবে। তাই সে যখন দেখল, লোকে বেশ কিছু শেয়ার ভাঙাতে আরম্ভ করেছে, তখন কয়েকটা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করল। আইনের আশ্রয় নিয়ে শেয়ারের মূল্য ধাতব মুদ্রার চেয়ে প্রথম পাঁচ পারসেন্ট এবং পরে দশ পারসেন্ট বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু এতেও সুফল হল না। ল উদ্বিগ্ন, বিভ্রান্ত হল। ১৭২০ সালের জানুয়ারী মাসে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। মরিয়া হয়ে রিজেন্টের সাহায্যে কঠিন আইন (Edicts) পাশ করিয়ে নিল। এই সব আইনের বলে কেউ তার কাছে পাঁচ শ' লিভর (২০ পাউণ্ড)-এর বেশী নগদ মুদ্রা রাখতে পারবে না। রাখলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এমন কি স্বর্ণালঙ্কার, সোনা রূপার প্লেট, হীরে জহরৎ প্রভৃতি রাখা নিষিদ্ধ হল। গুপ্তচর নিযুক্ত হল আইন-ভঙ্গকারীদের ধরবার জন্য। এর ফলে সারা দেশে এক নিদারুণ অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হল। সৃষ্টি হল সন্দেহ আর ত্রাসের, গৃহভৃত্যরা তাদের প্রভুদের ওপর নজর রাখতে লাগল। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করতে লাগল। বাড়ি বাড়ি সার্চ আরম্ভ হল।

কিন্তু এত সব করেও ল টিকাতে পারল না তার পরিকল্পনাকে।

মিসিসিপি শেয়ারের দর ক্রমেই পড়তে লাগল, লোকের মনে কিছুতেই আর আস্থা ফিরে এল না। শেয়াররর মূল্য অর্ধেক করে দেওয়া হল। কিন্তু তাতেও কোন সুফল হল না। রাস্তায় রাস্তায় লোকে ছড়া গাইতে লাগল—

"শেয়ার কিনলাম সোমবার,
লক্ষপতি হলাম মঙ্গলবার,
প্রাসাদ কিনলাম বুধবার,
গাড়ি হাঁকালাম বৃহস্পতিবার,
অপেরা দেখলাম শুক্রবার,
দেউলিয়া হলাম শনিবার।"

এমনি করে মিসিসিপি পরিকল্পনার সমাধি রচিত হয়, আর শেয়ার মেনিয়ার কবলে পড়ে বহু লোককেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

জন ল কোন অসাধু মতলব নিয়ে বা প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা সৃষ্টি করেননি, কিন্তু এই সর্বনাশের মূল বলে সকলেই জন লকে অভিযুক্ত করল। তার নিরাপত্তা হল বিপন্ন। রাস্তায় তার গাড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো করা হল। বাড়ির ভেতর ঢুকেও অপমান করতে, ভীতি প্রদর্শন করতে ছাড়ল না লোকে। সকলেরই দাবি লকে ফাঁসী দেওয়া হোক। প্রাণের ভয়ে ল সরে পড়ল ব্রুসেলসে, তারপর পালাল ভেনিসে। এখান থেকে গেল নিজের দেশ স্কটল্যাণ্ডে। কিন্তু এখানেও পেল না কোন অভ্যর্থনা, কোন আশ্রয় বা সাহায্য। রিক্ত আশাহত অসহায় অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে কাটাল বছর চারেক, তারপর আবার ফিরে এল ভেনিসে। এইখানেই ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে তার জীবনাবসান ঘটল।

মিসিসিপি পরিকল্পনার ফল হয় মারাত্মক। ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য হয় বিপর্যস্ত। একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় চারিদিকে। ঋণে জড়িয়ে পড়ে ফ্রান্স। একশত কোটি টাকার ঋণের বোঝা চাপে ওই দেশের ওপর।

ভ্রান্তিবিলাস

বনিক সোমদত্তের দুই যমজ সন্তানেরই নাম চিরঞ্জীব। এক ভাই অন্য ভাইয়ের ঠিক যেন কারবন কপি। এক ভাগ্যহীনা নারীরও দুই যমজ পুত্রের নাম কিংকর। এদের চেহারার মধ্যেও ছিল অত্যাশ্চর্য মিল। এই চারজন কি অঘটনই না ঘটিয়েছিল জয়স্থল শহরে। চন্দ্রপ্রভা তো তার স্বামী জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে বাড়ি থেকেই দূর করে দেয়, আর হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকেই স্বামী বলে মনে করে। সৃষ্টি হয় চরম বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির। কিংকরেরাও ঘটায় বিভ্রান্তি। স্বর্ণকার বসুপ্রিয়ও জড়িয়ে পড়ে এই ভ্রান্তি-আবর্তে। এই চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন বিদ্যাসাগর তাঁর 'ভ্রান্তিবিলাস' গ্রন্থে। শেক্সপীয়রের 'কমেডি অব এরারর্স' অবলম্বনেই তিনি রচনা করেন এই প্রহসন। শেক্সপীয়র অবশ্য তাঁর কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন প্লটাস্ থেকে।

চেহারার সাদৃশ্য নানা কৌতুককর সমস্যার সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে বিভ্রাটের। সাহিত্য ও ইতিহাসের পাতা উল্টালে পাওয়া যায় অনেক বিচিত্র কাহিনী।

মার্ক টোয়েনের রসিকতা

আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন পরিণত বয়সেও সুপুরুষ ছিলেন। একদিন এক পার্কে তিনি পদচারণ করছেন এমন সময় তাঁর সামনে উপস্থিত হল এক বালিকা। নির্ভয়ে সে বললে, 'আপনার সঙ্গে একটু বেড়াতে চাই, আপত্তি নেই তো?' মার্ক টোয়েন বিরক্ত হলেন না, বরং ছোট একটি বালিকার সাহচর্য লাভ করে খুশীই হলেন। ঘণ্টাখানেক নানারকম চিত্তাকর্ষক গল্প বলে তাকে মুগ্ধও করলেন। যাবার সময় তার হাতে ক্ষুদ্র একটা

মুদ্রা গুঁজে দিয়ে বললেন, 'সোনামণি, এবার যাও, ছুটে বাড়ি চলে যাও। যখন তুমি বড় হবে তখন বন্ধুদের কাছে বলো একদিন তুমি মার্ক টোয়েনের সঙ্গে বেড়িয়েছিলে এই পার্কে।' কথাগুলো শুনেই বালিকাটি বলে উঠল, 'ধ্যাৎ, তুমি কেন হবে মার্ক টোয়েন, আমি তো তোমাকে বাফেলো বিল বলে মনে করেছি।' এই বলেই সে কান্না শুরু করে দিল।

অসংখ্য চিঠি এবং ফটো আসতো মার্ক টোয়েনের কাছে। আসতো দূরদূরান্ত থেকেও। আসতো পরিচিত অপরিচিত নরনারীদের কাছ থেকে। পত্রলেখকেরা জানাত তারা মার্ক টোয়েনের মতই দেখতে, তাদের চেহারার সঙ্গে তার চেহারার হুবহু মিল আছে। চিঠি পড়ে, ফটো দেখে মার্ক টোয়েন বিস্মিত হতেন, ভাবতেন, কি আশ্চর্য, এতগুলো লোক কি করে তাঁরই মত হয় দেখতে। প্রত্যেকের চিঠির উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ উত্তর না দিলেও তো সৌজন্য রক্ষা করা যায় না। তাই অগত্যা এই রসিক সাহিত্যিক একই রকম চিঠি লিখেই সকল চিঠির প্রাপ্তি-স্বীকার করতেন। সেই মজার চিঠিটা উদ্ধৃত করছি। মার্ক টোয়েনের ছদ্মনাম ছিল এস ক্লিমেন্স।

"I thank you very much for your letter and your photograph. In my opinion you are more like me than any other of my numerous doubles. I may even say that you resemble me more closely than I do myself. In fact I intend to use your picture to shave by.

Yours faithfully,
S. Clemens.

ডিউক অব ওয়েলিংটন

লণ্ডনের টটেনহাম রোডে বাস করতেন মিঃ জোন্স। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ডিউক অব ওয়েলিংটনের চেহারার বেশ মিল ছিল। সাদৃশ্য ছিল এমনই বিস্ময়কর যে কে সত্যিকারের জোন্স আর কে ডিউক্ তা অনেকেই ধরতে পারত না। বিভ্রান্তি ঘটতো নানা জনের। জোন্স অবশ্য সামান্য ব্যক্তি ছিলেন। সমাজে তাঁর কোন প্রতিষ্ঠা ছিল না। কিন্তু সে ডিউকের মতই পোশাক পরত, নানাভাবে ডিউকের স্টাইল অনুকরণ করত। রাস্তায় জোন্সকে দেখলে পথচারীরা মনে করত যুদ্ধবিজয়ী বীর ডিউক যাচ্ছেন আর তারা তখন মাথা থেকে টুপি খুলে তাঁকেই অভিবাদন জানাত। জোন্সের বুক তখন ভরে উঠত গর্বে। তাঁর মনে হত তিনিই যেন ওয়াটারলু-বিজয়ী বীর ডিউক্ অব ওয়েলিংটন। রাস্তাঘাটে এইরূপ 'কমেডি অব এরারস' ঘটতো প্রায়ই। একদিন ডিউকের বন্ধুরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'জোন্স নামে এক ব্যক্তি আছে সে দেখতে ঠিক আপনার মতই, লোকে তাকে ডিউক বলে মনে করে, আপনার প্রাপ্য সম্মান সেই পায়।' এর উত্তরে ডিউক বলেন, 'তাই নাকি, এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমাকে তো কেউ মিঃ জোন্স বলে ভুল করে না।'

বাখ্ ভ্রাতৃদ্বয়

জার্মানীর বাখ্ (Bach) পরিবার পুরুষানুক্রমে সঙ্গীতচর্চার জন্য বিখ্যাত। এই বংশের জোয়ান সেবাসটিয়ান বাখ্ সঙ্গীতজগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এঁর পিতার নাম জোয়ান আমব্রোসিয়াস বাখ্। এঁরা ছিলেন দুই ভাই—দুই যমজ ভাই। অন্য ভাইয়ের নাম জোয়ান ক্রিস্টোফার বাখ্। এই দুই ভাইয়ের সাদৃশ্য ছিল অদ্ভুত। তাদের চেহারার সৌসাদৃশ্য অনেককেই বিভ্রান্ত করত।

সাধারণ লোক তো বটেই নিকটতম আত্মীয়রাও প্রায়ই ভুল করত এঁদের চিনতে। এমন কি এঁদের স্ত্রীরাও নাকি মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলত। এই দুই ভাই সঙ্গীতের অনেক সুর যোজনা করেন, কিন্তু কোন্ ভাই কোন্ সুর রচনা করেন তা বলা সহজ নয়।

দান্তের ভাগ্নে

দান্তের ভাগ্নে এণ্ড্রিয়া পোগির সঙ্গে দান্তের চেহারার বেশ মিল ছিল। একই রকম মুখের কাট, একই রকম শরীরের গঠন, এমন কি হাঁটবার ভঙ্গিটিও ছিল দান্তের মত। চেহারার দিক থেকে নরানান্ মাতুলক্রম। ইনিই দান্তের ইনফারনো কাব্যের সাতটি ক্যান্টো এক প্রতিবেশীর লোহার সিন্দুক থেকে খুঁজে বের করেন।

লর্ড কার্জনের খানসামা

ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের এক প্রিয় খানসামা ছিল। তার চেহারার সঙ্গে কার্জনের চেহারার আশ্চর্য মিল ছিল। কার্জনের মত পোশাক পরলে প্রায়ই লোকের বিভ্রান্তি ঘটত।

কার্জন যখন র‍্যাংকিনের দোকানে তাঁর নিজের জন্য পোশাকের অর্ডার দিতেন, তখন নাকি তাঁর এই প্রিয় খানসামার জন্যও একই রকম পোশাকের ফরমাস দিতেন। এই রাজপ্রতিনিধিকে নানা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে হত। ট্রেনে ভ্রমণ করবার সময় কখনও বা তিনি বই পড়ে সময় কাটাতেন, কখনও বা তন্দ্রাসুখ ভোগ করতেন। এই সময় তাঁর খানসামা দাঁড়িয়ে থাকত কামরার দরজার কাছে। ট্রেন থামলে নানা লোক আসত সেলাম জানাতে, দর্শনলাভ করতে এই মান্যবরের। খানসামাকে দেখেই দর্শনপ্রার্থীরা মনে করত কার্জন সাহেবই দাঁড়িয়ে আছেন তাদের অভিবাদন গ্রহণ করতে। এই খানসামাই নাকি স্মিতহাস্যে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করত। এ সব খবর লর্ড কার্জনের যে জানা ছিল

না তা নয়, কিন্তু তিনি খানসামাকে কখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে নিষেধ করেননি। বরং তিনি নাকি মনে করতেন, খানসামাই তাঁর অনেক সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে, অনেক বিরক্তি ও অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা করেছে তাঁকে।

পিলসুডস্কি ও নিৎসে

মার্শাল জোসেফ পিলসুডসকি ছিলেন পোল্যাণ্ডের ধুরন্ধর মন্ত্রী। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রের দিক্‌পাল। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুর অভাব ছিল না। রাজনীতির বন্ধুর পথে বহুবার তাঁকে তীব্র বিরোধিতা ও আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। জার্মান দার্শনিক নিৎসের সঙ্গে তাঁর চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। নিৎসে ১৮৯০ সালে উন্মাদ হয়ে যান। পিলসুডস্কির শত্রুরা এই মর্মান্তিক ঘটনার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। নিৎসের সঙ্গে তাঁরা পিলসুডস্কির তুলনা করে। ব্যাপারটা এমন মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় যে, পোলিশ গভর্ণমেণ্টকে আইন জারি করে পোল্যাণ্ডে নিৎসের ছবি প্রকাশ করা বন্ধ করে দিতে হয়।

এলেক ও এরিক বেডসার

ক্রিকেট-অনুরাগীদের কাছে এলেক বেডসার ও এরিক বেডসারের পরিচয় অজানা নেই। এই দুই বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়ও যমজ ভাই। এঁদের চেহারার মিল আশ্চর্যজনক। অনেক সময় এঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও নিকট আত্মীয়েরাও ভুল করেন এঁদের চিনতে। খেলার মাঠে এঁরা বহুবার ভ্রান্তিবিলাসের সৃষ্টি করেছেন। উচ্চাঙ্গের খেলার জন্য হয়ত কেউ এরিকের পিঠ চাপড়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, কেউ বা তাঁর বোলিংয়ের জন্য প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ায় কমেডি অব এরারসে। আসলে যাঁর প্রশংসা পাওয়া উচিত তিনি এরিক নন, এরিকের ভাই এলেক। অনেক সময়

আবার এরিক ভাল খেললে এলেক পেতেন বাহবা। একবার এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল লর্ডস্ মাঠে, এম-সি-সি বনাম সারে কাউন্টি দলের খেলার সময়।

যমজ-বিভ্রাট

এই তো সেদিন ফুটবল খেলার মাঠে একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। সংবাদ পরিবেশন করেছে রয়টার—২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে। ফ্রান্সের মেজ শহরে এক ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। তেইশ বছরের এক খেলোয়াড় আহত হয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে থাকেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য মাঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই তিনি আবার মাঠে নেমে প্রচণ্ড বেগে খেলা শুরু করে দেন। গোল দিয়ে বিপর্যয়ের হাত থেকে দলকে রক্ষাও করেন। কিন্তু কে এই খেলোয়াড়? তিনিই কি সেই আহত যুবক, যাঁকে মাঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়? খেলার ঠিক পরেই জানা যায়, এই গোলদাতা সেই আহত খেলোয়াড় নন, ইনি তাঁর যমজ ভাই। তাঁদের চেহারার সাদৃশ্য এমনই বিস্ময়কর যে, দর্শকেরা কেউই বুঝতে পারেনি কোনটি কে।

ভোট বিচিত্রা

স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। কোন কালে কোন দেশে এত বৃহৎ, এত বিচিত্র ভোটপর্ব কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। এ নির্বাচনের তুলনা নেই। এই স্মরণীয় নির্বাচনের কয়েকটি বিচিত্র ছিন্নচিত্র তুলে ধরছি এখানে।

বিচিত্র প্রচার

নির্বাচনী প্রচারের প্যাটার্ণ বিচিত্র বিস্ময়কর। উত্তরপ্রদেশের এক ভোটপ্রার্থী একটা উটের ওপর চড়ে প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। এই বিরলদর্শন প্রাণীকে দেখতে রাস্তায় ভিড় জমে যায়। কেউ হাতির পিঠে চড়েই প্রচার করে বেড়ান। এক প্রার্থী নিজের নির্বাচনী প্রচারপত্র বড় বড় অক্ষরে ছেপে সাইন-বোর্ডের মত নিজের গায়ে ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। এক এক জায়গায় আবার বক্তৃতাও দেন, 'আমি শ্রী·········আমাকেই ভোট দিন'। একজন প্রার্থীর হাতে লণ্ঠন। তিনি নির্বাচন কেন্দ্রে লণ্ঠন জ্বেলে ঘুরে বেড়ান। রাত্রে তো বটেই, দিনের বেলাও হাতে থাকে ঐ প্রজ্বলিত লণ্ঠন। লোকে টিপ্পনি কাটে, কিন্তু তিনি হেসে বলেন, 'দেশ থেকে অন্ধকার দূর করতে হলে এই নির্বাচনী লণ্ঠনই দরকার।' আসামের এক প্রার্থী এক অভিনব প্রচার ব্যবস্থা করেন। তিনি হরিনাম-সংকীর্তনের মাধ্যমেই প্রচারকার্য চালান। এক প্রার্থী একটা মোটর গাড়িতে লাউডস্পিকার ফিট করে তার সামনে একটা জীবন্ত মোরগকে বসিয়ে রাখেন। লাউডস্পিকারের মাধ্যমে মোরগের ডাক বেশ কৌতূহল ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

নয় সপ্তাহব্যাপী প্রচার অভিযান চালিয়ে পণ্ডিত নেহরু রেকর্ড স্থাপন করে গেছেন। তাঁর নির্বাচনী-সফর থেকে বহু বিচিত্র তথ্য

পাওয়া যায়। তিনি বিমান পথে ১৮০৫৬ মাইল, মোটর গাড়িতে ৫২৬৬ মাইল, রেলপথে ১৬১২ মাইল এবং জলপথে ৯০ মাইল ভ্রমণ করেন। বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা করেন ২৯২টির বেশি। অসংখ্য ছোট ছোট সভার তো হিসেব নেই। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি আসমুদ্র হিমাচল ঘুরেছেন।

বিচিত্র ভোটার

ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে ভোট দিতে আসে ভিক্ষুক, আসে খঞ্জ অন্ধ ন্যুব্জ ভোটার। জরাগ্রস্ত স্থবির আসে নাতির ঘাড়ে চেপে। কেউ আসে ঠেলাগাড়িতে, কেউ প্রতিবেশীর হাত ধরে। বন-জঙ্গলের বুক চিরে এসেছে ভোট দিতে, হারিয়েছে সন্তান। বাঘের পেটে গেছে অনেকে। কোন কোন ভোটকেন্দ্রে ভোটপ্রার্থীর দর্শন না পেয়ে ভোট না দিয়েই চলে গেছে অনেকে। বটগাছ মার্কা বক্সে ভোট দিতে এসে বটগাছ না দেখতে পেয়ে নিরাশ হয়ে পাশের বটগাছেই চড়ে বসেছে। কেউ বা 'জোড়া বলদকে' ভোট দাও শুনে সত্যিকারের এক বলদের পিঠে ভোটপত্র চাপিয়ে দিয়েছে। অত্যুৎসাহী ভোটারেরও অভাব ঘটেনি। ঔরঙ্গাবাদের এক ভোটারের পিতা ভোটের দিন সকালেই মারা যায়। কিন্তু তাহলে কি হয় ভোট তো তার দেওয়া চাই-ই। তাই পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ফেলে রেখে সে আসে ভোটকেন্দ্রে। বাসরঘরের মধুর আমেজ তখনও লেগে আছে এক ভোটারের মনে। ফুলের মালা গলায় ঝুলছে, সেও ছুটে এসেছে ভোটকেন্দ্রে। তার কাছে বিবাহ উৎসবও যেমন প্রয়োজনীয় ভোট দেওয়াও তেমনি। এক অন্ধ মহিলার উৎসাহের সীমা নেই। কারুর সাহায্য না নিয়েই সে ভোট দিতে চায়। ভোটের বাক্সগুলি নেড়েচেড়ে দেখে যে বাক্সটি সবচেয়ে ভারি তারই ভেতর ভোটপত্রটি গলিয়ে দেয়। এক বৃদ্ধা স্বামীর নাম উচ্চারণ করবার পূর্বে বেশ

কয়েক মিনিট ধরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানায়। উজ্জয়িনী অঞ্চলের কৃষক রমণীরা তো ভোটের দিন বর্ণাঢ্য পোশাক পরে, নানা প্রকার অলংকারে সেজে কোরাস গান গাইতে গাইতে ভোট দিতে আসে। কালিম্পঙের এক সরল পার্বত্য রমণী মোরগকে ভোট দেবার জন্য ভোট কেন্দ্রে আসে। মোরগ দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়ে সে বাড়ি ফিরে যায়। ব্যালটপত্রটি অবশ্য বাড়ির একটা মোরগের জন্যই নিয়ে যায়।

ব্যাঙ্গালোরের এক ভোটকেন্দ্রে এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী উপস্থিত হন। আঙুলে কালি মাখতে তিনি রাজী হন না। এই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি ঘোরতর আপত্তি জানান। বলেন, দুবার ভোট দেওয়া বন্ধ করবার জন্য আঙুলে কালি মাখতে হবে, এটা অন্যায়, ইতরামি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি ভোট না দিয়েই চলে যান। এক ভোটদাতা ব্যালট পেপারকে ১২ টুকরো করে বিভিন্ন প্রার্থীর বাক্সে নিক্ষেপ করে। তার বক্তব্য সে প্রত্যেককেই ভোট দেবে বলে কথা দিয়েছিল। কাজেই এ ছাড়া আর উপায় কি? ভদ্রলোকের তো প্রতিশ্রুতির দাম আছে। পল্লী অঞ্চলের এক ভোটার টাঙ্গায় চড়ে ভোটকেন্দ্রে আসে। পৌঁছেই টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দেবার জন্য এক প্রার্থীর এজেন্টকে বলে। সে রাজী না হলে ঐ প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বীকেই ভোট দেয়। নদীয়া জেলার এক আসনে কোন এক প্রার্থী ভোট পান মাত্র চারটি। ভোটদাতারা হচ্ছেন— তাঁর মাতা, পিতা, পিসি ও খুড়ি।

বিচিত্র অনুরোধ

এগারো বছর বয়সের দুই বালিকা তাদের ঠাকুরমার সঙ্গে আসে ভোটকেন্দ্রে। ঠাকুরমার মত তারাও ভোট দেবে। একেবারে নাছোড়বান্দা। তাদের বোঝান হয়, এত কম বয়সে ভোট দেওয়া

যায় না। কিন্তু তাদের বক্তব্য, দুজনের বয়স যোগ করলে ২১ বছরের বেশী হবেই, অতএব তাদের অন্তত একটি ভোটপত্র দেওয়া হোক। তাও হল না দেখে চোখের জলে ভাসিয়ে দিল ভোটকেন্দ্র। ভাটপাড়া কেন্দ্রের এক বৃদ্ধা ভোট দিতে আসেন। তিনি বলেন, আমার ছেলে বৌমাকে আনতে বাড়ি গেছে, বলে গেছে তার হয়ে ভোট দিতে, অতএব ছেলের হয়ে আমাকেই ভোট দিতে দেওয়া হোক। ভরতপুর জেলার এক কৃষক জানায়, তার স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করেছে, কাজেই সে ভোট দিতে আসতে পারবে না। তার সঙ্গে কাউকে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করে সে ভোটটা নিয়ে আসতে।

বাংলার এক স্বনামধন্য চিকিৎসকের কাছে এক চিঠি আসে। চিঠির লেখক সাধারণ এক ভোটদাতা। তার অনুরোধ, আমার স্ত্রী আপনাকেই ভোট দিতে চায়, কিন্তু সে গুরুতর অসুস্থ। তাকে নিরাময় করে তুলুন। উত্তরে সহানুভূতিশীল চিকিৎসক রোগিণীকে তাঁর চেম্বারে দেখিয়ে যাবার জন্য দিন ও সময় নির্দিষ্ট করে দেন। ছ বছরের এক বালক তার মায়ের সঙ্গে আসে ভোটকেন্দ্রে। ভোট সেও দেবে। তাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে হাতে এক টুকরো কাগজ দেওয়া হয়। সেই কাগজটা সে বাড়ি গিয়ে একটা বাক্সের মধ্যে রেখে দেয়। এমনি অনেক প্রকারের অনুরোধ আসে পোলিং অফিসারের কাছে।

বিচিত্র সমস্যা

সাধারণ নির্বাচন সৃষ্টি করে নানা সমস্যা। বহু জটিল সমস্যার সমাধান করতে হয় পোলিং অফিসারকে। এক হিজরাকে কেন্দ্র করে বেশ জটিল সমস্যা দেখা দেয়। তার নাম পুরুষ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে, কিন্তু সে এসেছে রীতিমত নারীবেশে। স্বভাবতই সে নারী না পুরুষ এই নিয়ে তর্ক ওঠে। তাকে অবশ্য পুরুষ

বলেই ধরা হয় ও পুরুষ কেন্দ্রেই ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া হয়।

অন্য একটি সমস্যা দেখা দেয় এক অচল সিকিকে কেন্দ্র করে। ব্যালট বাক্সের ভেতর এক ভোটার একটা অচল সিকি ঢুকিয়ে দেয়। সিকিটা ফেলে দেওয়া যায় না বা নষ্ট করাও চলে না, কারণ ওটা সরকারী সম্পত্তি। আবার সিকিটাকে ট্রেজারীতেও জমা দেবার উপায় নেই, কারণ অচল সিকি ওখানে জমা দেওয়া যায় না। এক সাঁওতাল রমণী ভোট দিতে এসে প্রসব বেদনা অনুভব করে। ভোট দেওয়ার ঠিক পরেই একটি সন্তান প্রসব করে। ভোটকেন্দ্রে আঁতুড় ঘরেরও ব্যবস্থা করতে হয়।

বিচিত্র বিরোধ

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বহু নাটকীয় ঘটনারও উদ্ভব হয়। গার্হস্থ্য-জীবনে ফাটল ধরে, স্বামী স্ত্রী, আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে মতান্তর মনান্তর ঘটে, ডেকে আনে অভিশাপ। বিন্ধ্য প্রদেশের এক মহিলা তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে এক বিচিত্র অভিযোগ জানান। তাঁর স্বামী নির্বাচনী প্রচারে এমন মেতে ওঠেন যে নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিবারের দিকে নজর দেবার সময় পান না। তাই তাঁর স্ত্রী বলেন, যে ব্যক্তি মনোনয়ন পাওয়া মাত্রই এই প্রাথমিক দায়িত্ব বিসর্জন দিতে পারেন, নির্বাচিত হলে তিনি কি করে জনসেবার গুরুদায়িত্ব বহন করবেন। অতএব তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করে দেওয়া হোক। বহু স্থানেই পতি-পত্নীতে, পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, শ্যালক-ভগ্নীপতিতে, বন্ধুতে বন্ধুতে সংঘর্ষ বেধেছে, কোথাও কোথাও কুরুক্ষেত্র কাণ্ডও ঘটেছে। সঞ্জীব রেড্ডী তো তাঁর ভগ্নীপতির কাছেই পরাজিত হন।

জনৈক ভদ্রলোক এক ভোটপ্রার্থীর জন্য জোর প্রচারকার্য চালান।

বহু সংখ্যক ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের রাজীও করান। কিন্তু একদিন দেখতে পান তাঁরই পুত্র অন্য এক প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করে সব বানচাল করে দিয়েছে। অধিকাংশ ভোটদাতাই পুত্রের পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে উদ্যত হয়েছে। ভদ্রলোক বিপন্ন হয়ে পুত্রকেই গৃহ থেকে বিতাড়িত করে দেন। বারিপাদা অঞ্চলের এক নির্বাচনকেন্দ্রে কোন্ প্রার্থীকে সমর্থন করা হবে এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রীতিমত লড়াই বেধে যায়। ভোটগ্রহণকেন্দ্রে যাবার পথে তুমুল কাণ্ড বাধে। স্বামী স্ত্রীর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে আর সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তরুণদের সঙ্গে বৃদ্ধদের মতান্তর অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু নির্বাচন ব্যাপারে দেখা দেয় বিচিত্র সমস্যা। এক জায়গায় বৃদ্ধদের সঙ্গে তরুণদের মতভেদ হয়। তরুণেরা ফতোয়া জারি করে, বৃদ্ধেরা তাদের মতানুসারে ভোট না দিলে গৃহত্যাগ করে স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে পৃথক হয়ে যাবে। বৃদ্ধেরা হুমকী ছাড়ে, তাদের মতানুসারে ভোট না দিলে পারিবারিক সম্পত্তি থেকে তাদের বঞ্চিত করবে। বাধে দ্বন্দ্ব। তরুণদের মধ্যে যে সর্বজ্যেষ্ঠ সে অনশন ব্রত করে ব্যাপারটা আরও ঘোরাল করে তোলে।

বিচিত্র ভুল

ভোটাস লিষ্টে বিচিত্র সব ভুলের সমাবেশ দেখা যায়। সাঁকরাইল নির্বাচন কেন্দ্রে জনৈক ভোটদাতা দেখেন তাঁর পিতার নাম সঠিক লেখা নেই। কি করে সে ভোট দেবে? অন্য লোকের পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে সে তো ভোট দিতে পারে না। কাজেই ভোটের মুর্দাবাদ করে সে বাড়ি ফিরে যায়। বজবজ কেন্দ্রের এক ভোটদাতার নামের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত হয়ে এক বিভ্রাট সৃষ্টি করে। ধরুন ভোটদাতার নাম অনিল, কিন্তু ছাপা হয় অনিলা।

অনেক বোঝাবার পরও সে ভোট দিতে রাজি হয় না। অনেক কেন্দ্রে পিতার নাম, স্বামীর নাম ভুল ছাপা হয়েছে বলে ভোটদাতারা নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। অনেক স্থলে মুশকিল হয়েছে মোহন, কান্ত প্রভৃতি মধ্যপদগুলো নিয়ে। কোথায় ছাপা হয়েছে কিশোরীমোহনের জায়গায় শুধু কিশোরী, কোথাও বা রাধাকান্তর স্থলে ছাপা হয়েছে রাধা। ফলে বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। রাধাকান্ত তো রাধা হয়ে ভোট দিতে পারে না। কোন কোন স্থানে তাদের চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বিচিত্র দুর্নীতি

ভোট দেওয়ার মধ্যেও অনেক দুর্নীতি ঢোকে। জাল ভোট তারই দৃষ্টান্ত। এক ভোটপ্রার্থীর কথাই বলি। তার নিজের বাড়ির ১৮টি ভোট ছিল, কিন্তু তার পরিবারের ভোটাররা বুথে এসে দেখে তাদের সব কটা ভোটই কারা দিয়ে চলে গেছে। এমন কি প্রার্থীর নিজের ভোটটাও কে আগেই দিয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে কি আর করবে সে? কিছুক্ষণ হাত-পা নেড়ে এক রিক্শায় চড়ে বাড়ি ফিরে যায়। এক কেন্দ্রে ভোট দিতে গেলে পোলিং অফিসার এক ব্যক্তিকে তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করে। সে বলে সে জানে না, জিজ্ঞাসা করে আসতে হবে।

সংবাদপত্রে একটি মজার খবর প্রকাশিত হয়। এই বিস্ময়কর বিচিত্র ঘটনাটি উদ্ধৃত করছি এখানে: "ভোটের তালিকা ছাপা হবার পরে অনেকের বাবা মারা গেছেন, এমন একজন পিতৃহারা পুত্র পোলিং এজেন্ট ছিলেন। তিনি দেখেন সকাল আটটার মধ্যে তাঁর পিতা ভোট দেবার জন্য বুথে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভোট দেবার জন্যে পিতা যখন ঘরে ঢুকে নাম-ধাম বলে ব্যালট পেপার নিয়ে পাশের পর্দা ঘেরা ঘরে ঢুকতে যাবেন ঠিক সেই সময় তাঁর পুত্র তড়াক করে

লাফ দিয়ে উঠে এসে ঝাপটে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, এই যে বাবা আমার—কোথায় ছিলে বল এতদিন? তুমি যে সেদিন মরে গেলে, সেটা তাহলে ইয়াকি করেছিলে বল? সেই ভৌতিক ভদ্রলোক নিরুপায় হয়ে রসিকতা করাই সাব্যস্ত করলেন এবং বললেন,—না বাবা তা নয়—স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটটা দেবার আগেই আমার মৃত্যু হয়েছিল, তাই আমার আত্মা ছটফট করে প্রেতলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ভোটটা দিয়ে যেতে পারলে আমার আত্মার শান্তি ও সঙ্গতি হবে, তাই বাবা ভোট দিতে এসেছি, ইয়াকি করব কেন?"

এই ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। চোঙা ফুঁকে প্রচারিত হল, মৃত পিতা ভোট দিতে এসে পুত্রের হাতেই ধরা পড়েছে—সাবধান, সাবধান!

বিচিত্র তথ্য

এই নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল বিপুল—১৭ কোটি ৩২ লক্ষ। ভোটারের তালিকা ছাপতে কাগজ লেগেছিল ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ২ শত ১৫ রীম। ১৬ হাজার কেরানীকে ৬ মাস ধরে হিমসিম খেতে হয়েছিল। আঙুলে লাগাবার জন্য কালি লেগেছিল ৩ লক্ষ ৮০ হাজার শিশি। এর দাম ২ লক্ষ টাকা। নির্বাচনের জন্য ৬০ কোটি ব্যালট পেপার ছাপান হয়েছিল। এর জন্য কাগজ লেগেছিল ১৮০ টন; দাম ১০ লক্ষ টাকা। ২৫ লক্ষ ব্যালট বাক্স লেগেছিল এই নির্বাচনে; দাম দিতে হয়েছিল ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। বিশ্বের বৃহত্তম নির্বাচনের কয়েকটি তথ্যই দেওয়া হল এখানে দিক্‌দর্শন হিসাবে।

ঘুড়ি ওড়ে নানা দেশে

কোন্ দেশের আকাশে প্রথম ঘুড়ি উড়েছিল তা বিতর্কের বিষয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, খৃঃ পূর্ব চারশো বছর আগে গ্রীক নগরী টেরাণ্টামে আরকাইটাস্ নামে এক ব্যক্তি প্রথম ঘুড়ির আবিষ্কার করেন। চীনারা বলে হেন্সিন্ নামে তাদের এক সেনাধ্যক্ষ খৃঃ পূর্ব ২০৬ সালে কোন এক যুদ্ধে প্রথম ঘুড়ির ব্যবহার করেন। সে যাই হোক এ কথা অনস্বীকার্য যে ভারত, চীন, জাপান, কোরিয়া, শ্যাম, মালয় প্রভৃতি দেশগুলিতেই ঘুড়ির আবির্ভাব ঘটে প্রথমে।

কোরিয়ায় নববর্ষের প্রথম কয়েকদিন ঘুড়ি ওড়ানোর ধূম পড়ে যায়। বালক-বালিকারা তো বটেই যুবক ও বৃদ্ধেরাও মেতে ওঠে এই সময়। থাইল্যাণ্ডে মার্চ মাসে যখন প্রবল বাতাস বইতে থাকে তখন সে দেশের আকাশ ছেয়ে যায় ঘুড়িতে। উদ্দীপনা উত্তেজনা দেখা দেয় ঘুড়ির প্রতিযোগিতায়। ঘুড়ির সঙ্গে যে হুইসিল বেঁধে দেওয়া হয় তার তীক্ষ্ণ আওয়াজ আনন্দ ও কৌতুকের সৃষ্টি করে। নিউজিল্যাণ্ডের মাওরি জাতির মধ্যেও ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ বেশ আছে।

জাপানে ৫ই মে বালক-বালিকাদের উৎসবের দিন। জাপানী ভাষায় বলা হয় 'টাঙ্গো-নো-সেক্কু' বা বালকদের উৎসব। এইদিন প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই মাছ-ঘুড়ি ওড়ে। এই কার্প মাছ জাপানীদের কাছে সাহস ও দীর্ঘজীবনের প্রতীক বলে গণ্য। মাছ ঘুড়ি তৈরি হয় কাগজ ও কাপড় দিয়ে। কোন কোন ঘুড়ি ৩০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়।

শীতপ্রধান দেশের আবহাওয়া বেশীর ভাগ সময়ই ঘুড়ি ওড়ানোর পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু তাহলেও জুন জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ডের

কিছু ছেলেমেয়ে ঘুড়ি ওড়ায়। ঘুড়ি ওড়ানোর অবশ্য কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। উন্মুক্ত প্রান্তরে, জনবিরল উপত্যকায়, খোলা মাঠে, নদী বা সমুদ্রের তীরে ঘুড়ি ওড়ায়। লণ্ডনের হাইড পার্কে অনেককে ঘুড়ি ওড়াতে দেখা যায়। ঘুড়ি সাইজে বড় ও বর্ণালী। এরা 'পাইলট-কাইটও' ওড়ায়। বড় বড় ঘুড়ির সঙ্গে লেজুড় থাকে ছোট ছোট ঘুড়ি। প্লাইউড দিয়ে তৈরি খেলনা এরোপ্লেনও উড়িয়ে থাকে।

ঘুড়ি অনুরাগীর সংখ্যা ইংল্যাণ্ডের চেয়ে আমেরিকাতেই বেশী। এখানে ঘটা করে ঘুড়ির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বেশ আর্টিষ্টিক ঘুড়ি ব্যবহৃত হয়। যে সবচেয়ে সুন্দর ঘুড়ি তৈরি করতে পারে, যার ঘুড়ির ডিজাইন সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক তাকে দেওয়া হয় পুরস্কার। যে সবচেয়ে বেশী উচ্চে ঘুড়ি ওড়াতে পারে এবং যে খুব জোর টান মারতে পারে তাকেও পুরস্কৃত করা হয়। নানা আকারের ঘুড়ি ওড়ে আকাশে। কোন ঘুড়ি তিন ফুট লম্বা, কোনটা বা ছোট আকারের। এ ছাড়া 'বক্স' ঘুড়ি তো আছেই। প্রত্যেক ঘুড়ি-প্রতিযোগিতার সময় সঙ্গে থাকে ঘুড়ির হাসপাতাল, ছেঁড়া ভাঙা ঘুড়ি মেরামত করবার জন্য। আমেরিকায় আবার ঘুড়ি ওড়ানোর সময় কতকগুলো নিয়ম পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন—ঘুড়ি তৈরি করতে কোন ধাতু ব্যবহার করবে না। টেলিফোন, ট্রলি বা অন্য কোন বৈদ্যুতিক তারের কাছে ঘুড়ি ওড়ানো বিপজ্জনক। বজ্রবিদ্যুতের সময় ঘুড়ি ওড়াবে না। ভিজে তার বা সুতো ব্যবহার করবে না।

আমাদের দেশে মোঘল বাদশাহদের সময় ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ বিলক্ষণ ছিল। অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, 'মহর্ষিদেব তখন ডালহৌসী পাহাড়ে যাচ্ছেন, তখনকার দিনে রেলপথ ছিল না। নৌকা করেই যেতে হোত। দিল্লী ফোর্টের নীচে দিয়ে বোট চলেছে, তখন দেখতে পান কেল্লার বুরুজের ওপর দাঁড়িয়ে দিল্লীর শেষ বাদশাহ

ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। রাজ্য চলে গেছে তখনও মনের আনন্দে তিনি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন।'

মোঘল যুগে যুদ্ধক্ষেত্রেও যে ঘুড়ির ব্যবহার হয়েছিল তা জানতে পারা যায় অর্মে-এর হিস্টোরিকাল ফ্র্যাগমেণ্টস্ থেকে। শিবাজীর বিরুদ্ধে মোগল সম্রাট সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। প্রচুর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সুবাদার এসেছে শিবাজীকে দমন করতে। একের পর এক পার্বত্য দুর্গ হস্তচ্যুত হচ্ছে শিবাজীর, কিন্তু বেগনা দুর্গ তারা কিছুতেই অধিকার করতে পারছে না। শেষে এক ফন্দির আশ্রয় নিল এই সুবাদার। একটা ঘুড়ির লেজে একটা মশাল বেঁধে তা সুকৌশলে নামিয়ে দেওয়া হয় দুর্গের ভেতরে। এর ফলে দুর্গের ভেতরে বারুদের স্তূপে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণে দুর্গের প্রচুর সৈন্য প্রাণ হারায়।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্ণৌর ঘুড়ি-বিলাসীদের কথা বলা যাক। কথিত আছে, এক সময় লক্ষ্ণৌর লালা ফতেচাঁদ দুগারের সঙ্গে মামুদাবাদের নবাব হামিদ হাসান খানের ঘুড়ির লড়াই হয়। ঘুড়ির সঙ্গে নাকি সোনার আংটি লাগান হয়। প্রত্যেক আংটিতে চার আনার সোনা ছিল। পতঙ্গ্-লুটনেওয়ালাদের টাকা দেওয়া হতো ঘুড়ি আর আংটি কুড়িয়ে আনলে। লক্ষ্ণৌর অনেক বিখ্যাত পতঙ্গবাজের নাম শুনা যায়, ঘুড়ি প্রতিযোগিতায় তাদের কলা-কৌশলের কথা, তাদের বর্ণাঢ্য ডিজাইনের লাটাই ব্যবহারের কথা এবং তাদের দরাজ দিলের বিচিত্র কাহিনী। ঘুড়ি লুটবার জন্য পেশাদার লুটে-পতঙ্গ নিযুক্ত হত। অর্থ ব্যয়ও হত প্রচুর।

গুজরাটে মকর-সংক্রান্তির দিন ঘুড়ি ওড়ানোর ধুম পড়ে যায়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুবা, বৃদ্ধ, বালক-বালিকারা মেতে ওঠে। নানা বর্ণের নানা আকারের ঘুড়ি ওড়ে আমেদাবাদ, বরদা, কেম্বে, ব্রোচ, সুরাট প্রভৃতি শহরে। শুরু হয় ঘুড়ির কাটাকাটি, ঘুড়ির লড়াই। যে যত বেশী ঘুড়ি কাটতে পারে সেই পায় তত বেশী বাহবা।

গত শতাব্দীতে কলকাতার সৌখীন বাবুদের মধ্যে ঘুড়ি ওড়ানোর শখ ছিল অসাধারণ। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, 'বুলবুলের লড়াই দেখা ও ঘুড়ি উড়ান সে সময় শহরের ভদ্রলোকদিগের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল।…শহরের ভদ্রগৃহের নিষ্কর্মা ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়া ঘুড়ির খেলা দেখিতেন।' অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কানাই মল্লিকের শখ ছিল ঘুড়ি ওড়াবার। ঘুড়ির সঙ্গে পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট পর পর গেঁথে দিয়ে ঘুড়ি ওড়াতেন, সুতোর প্যাঁচ খেলতেন।' শুধু কানাই মল্লিক কেন অনেক ধনী সৌখীন ব্যক্তিও ঘুড়ির সঙ্গে নোট গেঁথে ঘুড়ি ওড়াতেন। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় আবার নাকি ব্যাণ্ডও বাজত।

পূর্ববঙ্গের ঘুড়ি ওড়ানোর কথা প্রসন্নময়ী দেবী বলেছেন তাঁর 'পূর্ব-কথা' গ্রন্থে। তাঁর কথাই উদ্ধৃত করছি, 'সেকালের ঘুড়ি উড়ান একালের বালকগণের কল্পনার অতীত। পল্লীর বৃদ্ধরাও সে ঘুড়ি উড়াইবার সহচর থাকিতেন। 'ঢাউস', 'কোয়াড়', 'মানুষ' এই সব বৃহৎ ঘুড়ি উচ্চে শূন্যে উড়াইবার সময় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা একত্র হইয়া সে তামাসা দেখিতে আসিতেন। এক এক খানা ঘুড়ি সপ্তাহ ধরিয়াও উড়িত, তাহার উড়িবার গর্জন বহু দূর হইতে শুনা যাইত। যে দল ঘুড়ি উড়াইয়া জয়লাভ করিত, তাহারা ঢাক বাজাইয়া 'খালেচণ্ডী'র পূজা দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইত।'

বিশ্বকর্মা পূজার দিন কলিকাতা শহরে ঘুড়ি ওড়ানো ব্যাপক আকার ধারণ করে। আনন্দ কলরব উদ্দীপনার অন্ত থাকে না। আবহাওয়া অনুকূল হলে তো কথাই নেই, শত সহস্র ঘুড়িতে আকাশ ছেয়ে যায়। নানা আকারের, নানা বর্ণের ঘুড়ির সমারোহ দেখা যায়। ঘুড়ি উড়িয়ে ঘুড়ি কেটে ঘুড়ি লুটে তরুণদের আনন্দের সীমা থাকে না।

যুদ্ধ বিগ্রহ, সেতু নির্মাণ, আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে ঘুড়ি ব্যবহৃত হয়। কোরিয়ার

এক সেনাধ্যক্ষ এক সময় ঘুড়ির সঙ্গে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে সৈন্যদের সংকেত জানিয়েছিল। চীনারা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য ঘুড়ির ভেতর জ্বলন্ত মশাল ব্যবহার করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী সাবমেরিনের সঙ্গে হেলিকপ্টারের মত একপ্রকার বড় ঘুড়ি ব্যবহৃত হয়। এই ঘুড়িকে জলের ওপর দিয়ে ইউবোট টেনে নিয়ে যায়। এই ঘুড়ির সঙ্গে ছিল একজন পর্যবেক্ষক। নাবিক ও বৈমানিকদের খুঁজে বের করবার জন্যও অনেক লাইফ-বোটের সঙ্গে ঘুড়ি যুক্ত থাকত। বুয়োর যুদ্ধের সময় ১৮৯৪ সালে ব্যাডেন পাওয়েল মানুষ-বাহী এক প্রকার বিরাট ঘুড়ি তৈরি করেন। আমেরিকাতে বিমান-বিধ্বংসী কামানের ব্যবহার শিক্ষা দেবার জন্য ঘুড়িকে টারগেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৮৮৭ সালে ডাগলাস্ আরকিবোল্ড ঘুড়ির সঙ্গে ক্যামেরা যুক্ত করে অনেক ছবি তুলেছিলেন। স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময়ও উইলিয়াম এডি ঘুড়ির সাহায্যেই প্রচুর ছবি তোলেন। পূর্বে আবহাওয়া রিপোর্ট সংগৃহীত হত ঘুড়ির সাহায্যে। ঘুড়ির সঙ্গে যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করে অনেক দুর্লভ তথ্য সংগ্রহ করা হত। ১৯০০ সালের প্রথমের দিকে আমেরিকার 'ওয়েদার বুরো' কাপড় ও কাঠ দিয়ে তৈরী বক্স ঘুড়ির ভেতর ছোট একটা 'মিটারোগ্রাফ্' বসিয়ে আর্দ্রতা, বায়ুর চাপ, উত্তাপ প্রভৃতি বহু তথ্য সংগ্রহ করে। ৫ই মে ১৯১০ সালে আমেরিকার মাউন্ট ওয়েদারে পিয়ানোর তার দিয়ে একসঙ্গে দশটা ঘুড়ি ওড়ানো হয়। ঘুড়িগুলো ২৩,৮০৫ ফুট আকাশে ওঠে। ১৮৯২ সালে মারকনি যখন অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের ওপর দিয়ে রেডিও সিগন্যাল পাঠান তখন তিনি বড় ঘুড়িরই সাহায্য নিয়েছিলেন। এর পর থেকে রেডিও সিগন্যাল পাঠানোর জন্য ঘুড়ি ব্যবহৃত হয়। এরোপ্লেন আবিষ্কারের পূর্বে ঘুড়ির সাহায্যে নানা কাজ করা হত। ইঞ্জিনীয়াররা সেতু নির্মাণ করবার সময় ঘুড়ির

সাহায্য নেয়। নায়েগারা জলপ্রপাতের ওপর ঝোলান সেতু নির্মাণ-কালে ঘুড়ির ব্যবহার অপরিহার্য হয়।

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল পিরামিড আকারের ঘুড়ি তৈরী করেছিলেন ১৯০৭ সালে। এই ঘুড়ির ওজন ছিল ২০৮ পাউণ্ড এবং এর সাহায্যে ১৬৮ ফুট উচ্চে উঠিয়েছিলেন এক লোককে। ১৮৯০ সালের কাছাকাছি অষ্ট্রেলিয়ায় লরেন্স হারগ্রেভ 'বক্‌স কাইট' নির্মাণ করেন। এই চতুষ্কোণ ঘুড়ির তিনিই প্রবর্তক। বক্‌স ঘুড়ি অবশ্য নানা প্রকারের হতে পারে। ঘুড়ির সাহায্যে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছিলেন বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন। একটা ঘুড়ি, একটা চাবি এবং একটা ঘুড়ির দড়ির সাহায্যে ঝড়ের সময় বাতাস থেকে কেমন করে তিনি বিদ্যুৎ আকর্ষণ করেছিলেন সে কাহিনী তো কারোর অজানা নয়।

বাল্য ও প্রতিভা

ভিয়েনার রাজপ্রাসাদ। ছোট্ট এক বালককে মেরি থেরেসার কন্যা হাত ধরে নিয়ে চলেছে ঝক্‌ঝকে মেঝের ওপর দিয়ে। এমন সুন্দর মসৃণ মেঝের ওপর কোনদিন তো তার চলার অভ্যাস নেই, তাই পা পিছলে পড়ে যায় সে। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারী মেরি আতোঁনাত তাকে তুলে নেয় সযত্নে। বালকটি তখনই তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে, 'তুমি খুব ভাল মেয়ে, তোমাকেই বিয়ে করব আমি।' বালিকার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়, তখনই মায়ের কানে পৌঁছে দেয় বালকের এই অদ্ভুত প্রস্তাব। মেরি থেরেসা বলেন, 'সে কি খোকা, এমন মতলব কেন হোল তোমার?' সহজ-ভাবেই বালকটি উত্তর দেয়, 'কৃতজ্ঞতার জন্যে।'

এ হচ্ছে দুশো বছর আগের কথা। বালকের নাম মোজার্ট, জন্ম ১৭৫৬, মৃত্যু ১৭৯১ সালে। তিন চার বছর বয়সেই শুরু হয়ে যায় তার রীতিমত সঙ্গীতচর্চা। পিতার কাছে নিরলস সুরচর্চা। অল্প বয়সেই অসাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে মুগ্ধ করে শ্রোতাদের। ইউরোপের নানা স্থানে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে বিপুল খ্যাতি লাভ করে বাল্যকালেই। সত্যিকারের 'প্রডিজি' ছিলেন মোজার্ট, সঙ্গীত জগতের সুদুর্লভ বাল্য-প্রতিভা।

সঙ্গীতজগতের বহু দিক্‌পাল বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন বাল্যেই। অনেকের সুর-সাধনা শুরু হয়েছে শৈশবেই। বিটোফেন ছিলেন অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ, চেহারা ছিল কদাকার, স্বভাব ছিল খিট্‌খিটে। প্রায়ই কালির দোয়াত উল্টে ফেলতেন পিয়ানোর ওপর। কিন্তু তা হলে কি হয়, এই ব্যক্তিই চার বছর

বয়সে গোটা তিনেক সনেটা রচনা করে ফেলে। বয়স যখন নয় তখন তার সঙ্গীতজ্ঞ পিতা তাকে বলেন, 'আমার যা কিছু শিক্ষা দেবার ছিল সবই তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছি।' বার বছর বয়সে বিটোফোন ডেপুটি অর্গানিষ্ট হয়ে থিয়েটারে অপেরা-ব্যাণ্ড পরিচালনা করে।

হাঙ্গেরীর বিখ্যাত সুরশিল্পী ফ্রাঞ্জ লিজ্‌ট তাঁর পিতার কাছেই বাল্যে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ন বছর বয়সে সঙ্গীত প্রতিভার এমন বিস্ময়কর পরিচয় দেয় যে হাঙ্গেরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অর্থ সংগ্রহ করে তার সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন ভিয়েনা নগরীতে। একদিন বিটোফেন শুনছেন এই বালকের সঙ্গীতঝংকার। তার কচি হাতের সুরসৃষ্টি শুনে এমনই মুগ্ধ হন যে মঞ্চে উঠে বালক লিজ্‌টকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখচুম্বন করেন। পরবর্তীকালে এই সুরসাধক এমন বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন যে রুমাল দস্তানা পোশাক তাঁর নামেই নামাঙ্কিত হয়। উদ্ভব হয় 'লিজ্‌ট-মেনিয়া'র। অনেক সঙ্গীত শিল্পীর জীবনপ্রভাত প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। হ্যাণ্ডেল সপিন, ইহুদি মেন্নুহিন প্রভৃতি অনেকেই শৈশবেই সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

বাল্যে যাঁরা অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে জার্মান মনীষী গ্যায়টের নাম বিশেষ স্মরণীয়। তাঁর পিতার সযত্ন শিক্ষার ফলে বাল্যেই তিনি নানা ভাষা ও বিচিত্র বিষয় শিক্ষা করেন। শুরু হয় ল্যাটিন্ গ্রীক হিব্রু ফ্রেঞ্চ ইংরেজী ইতালিয়ান ভাষা শিক্ষা। এ ছাড়া ইতিহাস ভূগোল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গণিত সঙ্গীত ধর্মতত্ত্ব অনেক কিছুই পাঠ্য তালিকায় স্থান পায়। তাঁর আট বছর বয়সের একসারসাইজ বুকে লেখা রচনা পাঠ করলে কেউই বুঝতে পারবে না এত অল্প বয়সের বালকের পক্ষে কি করে সম্ভব হয়েছে এমন নির্ভুল সুন্দর লেখা। সাত বছর বয়সে এই বালকই তার পিতার সঙ্গে আলোচনা করেছে সুন্দর ও

অসুন্দরের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে। বাল্যে তার স্মৃতিশক্তি ছিল যেমন প্রখর অনুসন্ধিৎসাও ছিল তেমনি গভীর।

ফ্রান্সিস গ্যাল্টন পড়া শুরু করেন আড়াই বছর বয়সে। পাঁচ বছর বয়সে তিনি ইলিয়ড ও ওডিসির সঙ্গে পরিচিত হন। ভলতেয়ার তিন বছর বয়সে ফনটেনের গল্প বলে যেতে পারতেন। ডঃ জনসন যখন পেটিকোট পরতে শেখেন তখনই তাঁর পড়াশুনা শুরু হয়। তিন বছর বয়সে গড়গড় করে পাতার পর পাতা পড়ে ফেলতেন। প্রতিবেশীরা কেউ এলে গাছে চড়ে বসতেন পাছে তাঁকে কেউ 'প্রডিজি' বলে প্রশংসা করে। আন্তর্জাতিক আইনের প্রবর্তক হল্যাণ্ডের হুগো গ্রোতিয়াস শৈশবকালেই প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দেয়। একে বলা হয় 'ওয়াণ্ডার চাইল্ড'। ইনি এগার বছর বয়সে আইন-শিক্ষা করেন এবং পনর বছর বয়সে ডক্টর অব্ ল উপাধিতে ভূষিত হন। দীর্ঘজীবী মনীষী টমাস হবস্ও বাল্যেই বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন।

ঐতিহাসিক মেকলের অধ্যয়ন-স্পৃহা ছিল অসাধারণ। তিন বছর বয়স থেকেই আরম্ভ হয় তাঁর বিচিত্র পাঠ। কম্বলের ওপর শুয়ে হাতে এক টুকরো রুটি আর একটু মাখন নিয়ে বইয়ের পর বই পড়ে যেতেন। খেলাধুলার চেয়ে বইই ছিল তাঁর বেশি প্রিয়। ১৮০৮ সালের এক চিঠিতে তাঁর মা বলেন, "আমার প্রিয় টম্ অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে, শিক্ষণীয় সকল বিষয়েই আশ্চর্যরূপে এগিয়ে চলেছে। এবং ইতিমধ্যে যা জ্ঞান আহরণ করেছে তা সত্যই আট বছরের ছেলের পক্ষে বিস্ময়কর। এক বছর আগে তার মাথায় খেয়াল চাপল সে বিশ্বের ইতিহাসের এক 'কম্‌পেণ্ডিয়াম' লিখবে এবং বাস্তবিকই সে এক দিস্তা কাগজ নিয়ে সৃষ্টিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক খসড়া রচনা করে ফেলে। তার অধ্যয়নস্পৃহা এমনই যে স্কটের 'লে' ও 'মারমিয়ন' কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে।" মেকলের মা কোন অতিশয়োক্তি করেননি। মেকলে ছিলেন

গ্রন্থকীট, দ্রুত পাঠও করতে পারতেন। এক সময় তিনি বলেছিলেন, "যদি 'প্যারাডাইস লস্ট' ও 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে স্মৃতি থেকেই তিনি সব লিপিবদ্ধ করে দেবেন।"

মেকলের ন্যায় প্রতিভাধর ছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। যেমন অধ্যয়নস্পৃহা তেমনি প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। তিন বছর বয়সে গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা শুরু করেন। পিতার সযত্ন তত্ত্বাবধানে বাল্যেই প্রবেশ করেন বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে। পিতা কিন্তু সকলের সামনে তাঁর পুত্রের বিস্ময়কর প্রতিভার কথা বলতেন না। আট বছর বয়সে তিনি গ্রীক ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ পাঠ করেন। আট বছর থেকে বার বছরের মধ্যে ভার্জিল, হোরেশ, লিভি, ওভিড, টেরেন্স প্রভৃতি লেখকদের নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালেই তিনি যে বিপুলসংখ্যক গ্রন্থ পাঠ করেন তার বিবরণ তিনি আত্মজীবনীতে দিয়ে গেছেন। জেরেমি বেন্থামও 'প্রডিজি' ছিলেন। ৫ বছর বয়সে তিনি লাটিন গ্রীক্ ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী ভাষায় নাকি কথা বলতে পারতেন।

আমাদের দেশের বহু মনীষীর জীবনপ্রভাত গৌরবদীপ্ত। শংকরাচার্য ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের কাহিনী তো বহু-কীর্তিত। এক বছর বয়সেই তিনি কথা বলতে পারেন। দু বছর বয়সে রামায়ণ, মহাভারত, বেদবেদান্ত থেকে অনেক অংশ উদ্ধৃত করতে পারতেন। তিন বছর বয়সেই তাঁর রীতিমত পাঠ শুরু হয়। সাত বছর বয়সের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল যেমন অসামান্য, মেধাও ছিল তেমনি বিস্ময়কর।

বিক্রমপুরের এক রাজার সন্তান। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সুখ ঐশ্বর্যকে এই বালক তুচ্ছ জ্ঞান করেন, আকৃষ্ট হন জ্ঞান আহরণের দিকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুরূহ দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। শাস্ত্রবিচারে পণ্ডিতদের পর্যুদস্ত

করেন। এই বালকের নাম চন্দ্রগর্ভ। অতীশ দীপঙ্কর নামেই তাঁর পরিচয়। ভারতে ও তিব্বতে এই জ্ঞান-তপস্বীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত।

স্যার্ আশুতোষের অধ্যয়নস্পৃহা ছিল অসাধারণ, অভিনিবেশের শক্তিও ছিল বিস্ময়কর। বাল্যেই তিনি গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 'কেম্ব্রিজ মেসেঞ্জার অব ম্যাথেমেটিক্যাল জার্নালে' দুরূহ গাণিতিক সমস্যার সমাধান তিনি প্রকাশ করেন ছাত্রাবস্থাতেই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ বাল্যেই ঘটে। একদিনেই নাকি তিনি বর্ণমালা আয়ত্ত করে ফেলেন। একদিন গুরুমহাশয় তাঁকে বলেছিলেন, "বাবা বঙ্কিম, এরূপভাবে পড়িয়া গেলে আর কতদিন তোমায় পড়াইব।" হুগলী কলেজে পাঠকালে তাঁর বহু কবিতা 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাস্তার মাইলস্টোন দেখেই তো বালক ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী অক্ষর পরিচয় হয়ে যায়। মাদ্রাজের রামানুজন তো তাঁর গণিতপ্রতিভার পরিচয় বাল্যেই দিয়েছিলেন।

কবিদের কাকলী শোনা যায় তাঁদের জীবন-প্রভাতেই। দুর্লভ কবিত্ব শক্তি নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের যাত্রা শুরু হয় বাল্য-শৈশবেই। 'পোয়েটস আর বরন্, নট মেড'। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'কবিত্ব ও ল্যাজ ভিতরে না থাকিলে টানাটানি করিয়া তাহাদের বাহির করা যায় না।' রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা নিয়ে; এই প্রতিভার বিস্ময়কর স্ফুরণ শুরু হয় শৈশবেই। তিনি বলেছেন 'মনে আছে ছাত্রবৃত্তির নিচের ক্লাসে যখন পড়ি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গোবিন্দবাবু গুজব শুনলেন যে আমি কবিতা লিখি। আমাকে ফরমাস করলেন লিখতে, ভাবলেন নর্মাল স্কুলের নাম উঠবে জ্বলজ্বলিয়ে। লিখতে হলো, শোনাতে হলো ক্লাসের ছেলেদের, শুনতে হলো যে, এ লেখাটা নিশ্চয়ই চুরি।' অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি বাল্যে, সব আমরা পাইনি, হারিয়ে গেছে অনেক;

কিন্তু যা পেয়েছি তার তুলনা নেই। তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'অভিলাষ' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। কবির বয়স তখন তের বছর।

কবি কামিনী রায় আট বছর বয়স থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর পিতা তাঁর বাল্যরচনায় প্রীত হয়ে তাঁকে কীর্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত উপহার দেন। তাঁর 'সুখ' কবিতাটি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেবার ছ' মাস পূর্বে রচিত হয়। মানকুমারী বসুর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা' তাঁর চোদ্দ বছর বয়সের রচনা। প্রকাশিত হয় 'সংবাদ প্রভাকরে'। মানকুমারীর বিবাহ হয় দশ বছর বয়সে। বিবাহের পর তিনি দিনের বেলায় গোপনে এক একটি কবিতা লিখে রাত্রিতে স্বামীকে উপহার দিতেন। তরু দত্ত বেঁচেছিলেন একুশ বছর, কিন্তু এই স্বল্পায়ু জীবনেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি যে কেবল ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মাণ ও সংস্কৃত ভাষাই শিখেছিলেন তা নয়, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় প্রশংসাধন্য অবদানও রেখে গেছেন। প্রতিভাধর মহিলাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্যা।

পোপ, টেনিসন, কোলরিজ, কীটস, ব্রাউনিং প্রভৃতি কবির প্রতিভা স্ফুরিত হয় বাল্যেই। কবি পোপ নিজেই বলেছেন, 'I lisped in numbers for the numbers came.' কবি টেনিসনের বয়স যখন পাঁচ তখন এক ঝড়ের সময় ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'I hear a voice that is speaking in the wind.' কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'রাতে মশা, দিনে মাছি এই নিয়েই কলকাতায় আছি' তাঁর তো শৈশবেরই রচনা।

সুকান্ত ভট্টাচার্য বেঁচেছিলেন মাত্র একুশ বছর। তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। ছাত্র বয়সেই রচিত সুকান্তর একাধিক কবিতার অনুবাদ হয়েছে,

তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। 'ছাড়পত্রে'র সমস্ত কবিতাই ১৩৪৩ থেকে ১৩৪৭ সালের মধ্যে রচিত। সুকান্তর জন্ম ১৩৩৩, মৃত্যু ১৩৫৪ সালে।

কয়েকটি চমক-লাগানো 'প্রডিজির' কথাও বলা যাক এখানে। এঁদের উল্লেখ অনেকেই করেছেন। ক্রিশ্চিয়ান হেনরি হেইনকেনের কথাই ধরা যাক। লুবেকের এই বালক নাকি এক বৎসর বয়সেই ওল্ড টেস্টামেন্টের গল্প জানতো। চৌদ্দ মাস বয়সে নিউ টেস্টামেন্টের গল্প শিখেছিল। আড়াই বছর বয়সে ইতিহাস ও ভূগোলের সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত। তিন বছর বয়সে ফরাসী ও লাটিন ভাষা শিখেছিল। এই বালক বেঁচে ছিল মাত্র চার বছর। এবং আশ্চর্যের বিষয় নিজের মৃত্যুর সম্বন্ধেও নাকি সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। ডরোথি ফন্ শ্লোডজের কথাও বলি। ইনি ছিলেন জার্মাণ। পিতা ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক, মাতা ছিলেন শিক্ষিত ঘরের মেয়ে। মাত্র পনেরো মাস বয়সেই বেশ কিছু কথা বলতে পারত। ছ বছর বয়সে পিথাগোরাসের গণিতসূত্র প্রমাণ করতে পারত। পরে সে ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন ও ভেষজবিজ্ঞানও শিক্ষা করেছিল। ষোল বছর বয়সেই সে লাতিন, গ্রীক, হীব্রু প্রভৃতি গোটা দশেক ভাষায় কথা বলতে পারত। গণিত, খনিজবিদ্যা, লাতিন, স্থপতিবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করে। বয়স তখন ১৬ বছর। এর জন্ম—১৭৮৭, মৃত্যু—১৮২৫ সাল। উইলিয়ম সিডিস্‌ও প্রতিভাধর বালক ছিল। এর পিতা ছিলেন হার্ভার্ডের অধ্যাপক। ছ' মাস বয়সেই এ বর্ণমালা পাঠ শেষ করে ফেলে। দু' বছর বয়সে লিখতে ও পড়তে পারে। ১১ বছরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এই বয়সেই 'ফোর্থ ডাইমেনসন' সম্বন্ধে আলোচনা করে অধ্যাপকদের তাক লাগিয়ে দেয়।

সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ছাড়া অভিনয়, চিত্রশিল্প, ক্রীড়াকৌতুক

প্রভৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিভাধর বালকদের চমক-লাগানো কীর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দাবা খেলার কথাই বলি। পোল্যাণ্ডের স্যামুয়েল রেসিভেস্কি ছিল এক অদ্ভুত বালক। আমেরিকায় এসে এই বালক ধুরন্ধর দাবাখেলোয়াড়দের তাক লাগিয়ে দেয়। এক ঘরভর্তি দাবাখেলোয়াড়দের সঙ্গে একলাই বিদ্যুৎগতিতে এক বোর্ড থেকে অন্য বোর্ডে গিয়ে সকলের সঙ্গে খেলে তাদের সকলকেই স্তম্ভিত করে দেয়। এই প্রসঙ্গে অনেকের কথা বলা যায় যারা বাল্যেই গাণিতিক হিসাবের বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দেয়, জটিল অঙ্কের সমাধান করতে পারে। জন বিভারের বয়স যখন পাঁচ তখন সে দু' মিনিটের মধ্যে ৪৪৪ পাউণ্ডকে ৪৪৪৪ দিন শতকরা চার পাউণ্ড চক্রবৃদ্ধি সুদে খাটালে কত পাউণ্ড হবে তা বলে দেয়। দশ বছরের বালক টুমেন সাফোর্ডকে গুণ করতে দেওয়া হয় বিরাট একটা সংখ্যাকে ঐরূপ সংখ্যা দিয়েই। অঙ্কটা পেয়েই লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকে ঘরে, চোখ মিটমিট করে তাকায় চারিদিকে এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই হাসিমুখে নির্ভুল উত্তর দেয়।

বুদ্ধি, প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। প্রতিভাধরদের কুলপঞ্জী ও জীবনেতিহাসও ঘেঁটেছেন অনেকেই। তাদের মনস্বীতাংশ বা বুদ্ধি মাপ-এর হিসাব করেছেন মনোবিজ্ঞানীরা। কেউ বলেন যাদের বুদ্ধির মাপ ১৪০-এর ওপর তারা জিনিয়াস, যাদের বুদ্ধির মাপ ২০০ বা তার কাছাকাছি তারা সুপিরিয়ার জিনিয়াস, অর্থাৎ অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। হলিংওয়ার্থ বলেন, যাদের বুদ্ধির মাপ ১৮০-র ওপর তাদের সংখ্যা বেশি নয়, প্রতি দশ লক্ষে ছ জন। টারমেনের মতে মিলস, গ্যায়টে, মেকলে, পাসকেল, লিবনিজ প্রভৃতি মনীষীদের বুদ্ধির মাপ ছিল ১৮০-র ওপর, আর গ্যালটনের ছিল ২০০। অবশ্য এমন অনেক প্রতিভাধরের নাম করা যায় যাঁদের বুদ্ধির মাপ ছিল ১৪০-এর নিচে। আমাদের দেশে বুদ্ধির মাপ নিয়ে সার্থক গবেষণা হয়নি,

হলে দেখা যেত বহুমুখী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধির মাপ (I. Q.) নিশ্চয়ই ২০০-র অনেক ওপরে।

কিন্তু বাল্যে প্রতিভার এত যে বিস্ময়কর বিকাশ দেখা যায় এর কারণ কি? প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই বা কি, কেনই বা উত্তরজীবনে অনেক প্রতিভাধর জনারণ্যে হারিয়ে যায়, কেন তারা মুকুলেই ঝরে যায়? উইলিয়াম সিডিস ছ' বছর বয়সে লিখতে পড়তে শিখেছিল, কিন্তু উত্তরকালে সে এক অখ্যাত কেরানী হিসাবেই জীবন শেষ করে। চমক-লাগানো গানিতিক হিসাব দেখিয়ে যারা অসংখ্য লোককে মুগ্ধ করে তাদের মধ্য থেকে তো নিউটন আইনস্টাইন রামানুজনের আবির্ভাব ঘটে না। এই সব প্রশ্নের সম্যক আলোচনা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়; তাই সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলছি এখানে। বুদ্ধি আর প্রতিভা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। কেউ জোর দেন উত্তরাধিকার বা বংশগতির (heredity) ওপর, কেউ বা গুরুত্ব দেন পরিবেশের ওপর। বাল্যে হীনমন্যতা (inferiority complex) থাকলে তার ক্ষতিপূরণ করার প্রচেষ্টা থেকেও প্রতিভার বিকাশ হতে পারে, এ কথাও বলেছেন কোন কোন মনোবিজ্ঞানী। এ কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, যাঁরা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী তাঁরা সৃজনশীল, প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এবং তাঁদের চিন্তাশক্তি মৌলিক। তাঁরা নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির অধিকারী। তাঁরা সৃষ্টি করেন রূপ, রস, সৌন্দর্যের, সন্ধান দেন জীবন-রহস্যের। এই সব অন্তর্নিহিত শক্তি (potentiality) না থাকলে কেউ কোন দিন প্রতিভাধর বলে গণ্য হতে পারে না। এখানে বংশগতির প্রভাব স্বীকার করতেই হবে। তবে সব সময়েই যে 'লাইক বিগেটস লাইক' হয় তা নয়। এর ব্যতিক্রম আছে। পরিবেশকেও উপেক্ষা করা চলে না। প্রতিভার বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশের ভূমিকা নগণ্য নয়। প্রতিকূল পরিবেশ অনেক সম্ভাবনাময় জীবনকে

অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। পিতা-মাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে যে পাথেয় নিয়ে শিশু তার জীবনযাত্রা শুরু করে তা ব্যর্থ হতে পারে যদি তার ভাগ্যে অনুকূল পরিবেশ না জোটে। কিন্তু তাই বলে শুধু অনুকূল পরিবেশ যথেষ্ট নয়। কোন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বালককে উপযুক্ত যত্ন, শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের সাহায্যে কিছু পরিমাণ উন্নত করা যায়, কিন্তু তাকে প্রতিভাধর করে তোলা যায় না। কাজেই বংশগতি ও পরিবেশ পরস্পরের পরিপূরক। প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশে এই দুইয়েরই প্রয়োজন।

বার্ধক্য ও প্রতিভা

অশীতিপর এক বৃদ্ধ এসেছেন বিচারালয়ে তাঁরই পুত্রের অভিযোগের উত্তর দিতে বিচারকদের কাছে। পুত্রের অভিযোগ : তাঁর পিতার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে, মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। কাজেই সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই দায়িত্বভার দেওয়া হোক তার ওপর।

এই বৃদ্ধ হচ্ছেন বিখ্যাত গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিস্। জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৪৯৬, মৃত্যু ৯০ বছর বয়সে।

বিচারকের এক প্রশ্নের উত্তরে দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমি যদি সফোক্লিস্ হই তাহলে আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেনি, আর আমার যদি মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে থাকে তাহলে আমি সফোক্লিস্ নই।' এর পর বিচারকদের কাছে নিবেদন করলেন, 'একটি নাটক এনেছি আমার সঙ্গে, আজই শেষ করেছি এই রচনা। নাম দিয়েছি এর 'ইডিপাস্ অ্যাট্ কলোনাস্'। যদি অনুমতি দেন তা হলে আপনাদের কাছে পড়ে শোনাই।' বিচারকেরা সাগ্রহে শুনলেন এই নাটক। পাঠ শেষ করে এই বর্ষীয়ান্ মনীষী বললেন, 'এবার আপনারা বিচার করুন আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে কি না।' মুগ্ধ হলেন বিচারকেরা তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে। পুত্রের সকল অভিযোগ থেকে তাঁকে তখনই মুক্তি দিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পুত্র আইওফনকে পিতার প্রতি অকৃতজ্ঞতার জন্য তিরস্কারও করলেন।

সফোক্লিসের ন্যায় বহু মনীষীই জন্মেছেন নানা দেশে। বার্ধক্য তাঁদের প্রতিভার দীপ্তিকে হরণ করতে পারেনি, তাঁদের সৃজনীশক্তিকে নিঃশেষিত করতে পারেনি। সারস্বত সাধনার ইতিহাসে এই বয়োবৃদ্ধেরা রেখে গেছেন অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর, তাঁদের প্রতিভার দান। তাঁদের জীবনসন্ধ্যার কীর্তিকাহিনী শুধু যে বিস্ময়কর তা নয়, প্রেরণারও চিরন্তন উৎস। এই সব বর্ষীয়ান্ শিল্পী, সাহিত্যিক ও

বৈজ্ঞানিকের জীবনকাহিনী থেকে মাত্র কয়েকজনের জ্ঞান-সাধনার কথাই আলোচনা করছি। এখানে বলছি শুধু অশীতি-ঊর্ধ্ব মনীষীদের কথাই।

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসে অনেক দীর্ঘজীবী মনীষীর পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের শেষ প্রান্তেও তাঁদের প্রতিভার বিচিত্র প্রকাশ স্তব্ধ হয়নি, লুপ্ত হয়নি জ্ঞান-লিপ্সা। এঁদের মধ্যে ঐতিহাসিক জেনোফোন বেঁচে ছিলেন ৯০ বছর, দার্শনিক জেনো ৯৮ বছর। এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে জেনো বলেছিলেন, 'বার্ধক্য? কই, এর বিরুদ্ধে আমার তো কোন অভিযোগ নেই।' ৯৪ বছর বয়সে আইসোক্রেটিস তাঁর বিখ্যাত 'প্যানথেলাইকাস' বক্তৃতা রচনা করেন। দার্শনিক ডাওজিনিসও বেঁচে ছিলেন প্রায় ৯০ বছর।

সক্রেটিসের শিষ্য ও অ্যারিস্টটলের গুরু গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। জ্ঞান-সাধনায় কেটেছিল তাঁর সুদীর্ঘ জীবন। ১২ বছর বিদেশ ভ্রমণ করে সঞ্চয় করেছিলেন বিপুল অভিজ্ঞতা। উইল ডুরাণ্ড বলেন, গঙ্গাতীরের হিন্দু দার্শনিকদের সংস্পর্শেও হয়তো তিনি এসেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর মানসিক শক্তি ছিল অক্ষুন্ন। বয়স যখন আশি তখন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন গ্রন্থ রচনায়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সুবিখ্যাত 'অ্যাকাডেমি' পরিচালনার দায়িত্বভার বহন করেন। একদিন তাঁরই এক ছাত্র বিবাহোৎসবে তাঁকে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানায়। প্লেটোর বয়স তখন ৮১। এই বয়সেই তিনি নৃত্য-গীত-আনন্দমুখর বিবাহ-বাসরে যোগ দেন। রাত্রিশেষে এই বাড়িরই এক নিভৃত কোণে তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন হন।

মার্কাস টেরেনসিয়াস ভ্যারো ছিলেন বিশাল পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত। ইনি প্রায় ৪৯০ (মতান্তরে ৬২০) খানি ছোট বড় গ্রন্থের রচয়িতা বলে রোমের ইতিহাসে কীর্তিত। এই বিপুল রচনাসম্ভারের মধ্যে কয়েকটি মাত্র পাওয়া গেছে, বাকি সব লুপ্ত হয়েছে। যুদ্ধ-

বিগ্রহ, দেশসেবা, রাষ্ট্রনীতি এই সব কাজে দীর্ঘ সময় কেটেছিল বটে, কিন্তু সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, কৃষি, ব্যাকরণ, ছন্দ, আইন, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয় তিনি সার্থক অনুশীলন করেছিলেন। ৮৯ বছর বয়সে এই জ্ঞান-সাধকের মৃত্যু হয়।

আশী বছর পরেও অদম্য উৎসাহ, বিস্ময়কর প্রতিভা ও প্রাণ-প্রাচুর্যের পরিচয় যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেটো (দি সেন্‌সার) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৮৪ বছর বয়সে তিনি গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি বলেন, 'আমার এখন ৮৫ বছর বয়স, কিন্তু আমার শারীরিক শক্তি হ্রাস পায়নি, বার্ধক্য আমার স্নায়ুকে দুর্বল করেনি, আমার উদ্যমকে দমিত করতে পারেনি।'

ইতালীয় চিত্রশিল্পী টিসিয়ানের (১৪৭৭-১৫৭৬) দীর্ঘ জীবনব্যাপী শিল্পসাধনার ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্ময়কর। রাজা, পোপ, ডিউক, সম্ভ্রান্ত নরনারী, পৌরাণিক ঘটনা, দেব-দেবী, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি তাঁর প্রায় ৬০০ চিত্রের বিষয়বস্তু। তাঁর অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে এই সব চিত্রসম্ভার। ৭০ বছর বয়সে দারুণ শীতের মধ্যে তিনি আল্পস পর্বত পার হয়ে পঞ্চম চার্লসের দরবারে উপস্থিত হন। ৭০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে বহু পৌরাণিক চিত্র তিনি অঙ্কন করেন। ৯৮ বছর বয়সে তিনি ঐতিহাসিক চিত্র বেটল অব লেপান্টি সৃষ্টি করেন। তাঁর শেষ ছবি পাইটা। এই বিশ্ববরেণ্য শিল্পীর জীবনাবসান ঘটে ৯৯ বছর বয়সে। মৃত্যু হয় প্লেগে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মগ্ন ছিলেন তিনি শিল্প-সাধনায়।

ভাস্কর, স্থপতি, কবি, চিত্রশিল্পী একাধারে বহু গুণের অধিকারী ছিলেন মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪)। তাঁর প্রতিভার তুলনা নেই। ৭ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্প-কৃতি দি লাষ্ট জাজমেণ্ট তিনি সমাপ্ত করেন ৬৬ বছর বয়সে। শেষ করেন 'মোসেস্ অ্যাণ্ড স্লেভস্' ৭০ বছর বয়সে। বয়স যখন প্রায় ৯০

তখনও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সম্রাট ডাইওক্লিসিয়ানের পুরাতন স্নানাগারকে গির্জায় রূপান্তরিত করার কাজে ব্যাপৃত হন। মৃত্যু হয় তাঁর ৮৯ বছরে। মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন মিতাহারী, সাধাসিধে ধরনের মানুষ। অর্থের প্রতিও তাঁর বিশেষ লালসা ছিল না। কোন কোন দিন এক টুকরা রুটিই আহার করে সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করতেন। এই অকৃতদার মনীষীর একটি মাত্রই আদর্শ ছিল—অনলস শিল্প-সাধনা।

ভেনিসের মনীষী লুইগি করনারো (১৪৬৭-১৫৬৬) শতায়ু ছিলেন। দীর্ঘজীবন লাভ করবার প্রকৃষ্ট উপায় বর্ণনা করে এক গ্রন্থ রচনা করেন ৮৩ বছর বয়সে। তাঁর জীবনকালেই এই গ্রন্থের চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বয়সেই তিনি স্বচ্ছন্দে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন, শিকার করতেন, নিজের হাতে একটানা আট ঘণ্টা লিখতে পারতেন।

এক অদ্ভুত জ্ঞানস্পৃহা নিয়েই জন্মেছিলেন 'লেভিয়াথান' গ্রন্থ প্রণেতা ইংরেজ দার্শনিক টমাস্ হবস্ (১৫৮৮-১৬৭৯)। বয়স তাঁর যখন ৮৪ তখন তিনি লিখলেন লাটিন ভাষায় আত্মজীবনী, বয়স যখন ৮৫ তখন ৪ খণ্ডে ইংরেজী ছন্দে 'ওডিসি'র অনুবাদ প্রকাশ করেন। সাহিত্য-জগৎকে তিনি বিস্মিত করেন ৮৭ বছর বয়সে 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসির' অনুবাদ প্রকাশ করে। ৯২ বছর বয়সে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখনও তাঁর সাহিত্য-প্রতিভা লুপ্ত হয়নি।

জার্মান মনীষী গ্যায়টের (১৭৪৯-১৮৩২) জীবন-কাহিনী অতি বিচিত্র। ৮ বছর বয়সে তিনি ডায়লগ রচনা করেন, ১২ বছর বয়সে ডুয়েল লড়েন, ১৪ বছর বয়সে প্রেমে পড়েন, ৭৪ বছর বয়সে এক অষ্টাদশীর রূপেগুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি অপরিসীম আগ্রহ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। জ্ঞানস্পৃহা ও সাহিত্য-সাধনা কোনদিন স্তিমিত হয়নি। প্রতিভার দীপ্তিতে তাঁর জীবন ছিল সমুজ্জ্বল। এক

অসাধারণ প্রাণ-প্রাচুর্য দিয়েছিল তাঁর শরীর ও মনকে সজীবতা, প্রফুল্লতা। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেও তাঁর জীবনীকার একারম্যান মনে করেছিলেন গ্যায়টে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন। ৮২ বছর বয়সে তিনি ফাউস্টের দ্বিতীয় ভাগ রচনা সমাপ্ত করেন। ৮৪ বছর বয়সে যখন তিনি পদার্পণ করেন তখনও কেউ তাঁর জীবনে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি, অবসাদ বা নৈরাশ্যের লক্ষণ দেখতে পায়নি। মৃত্যুর আধ ঘণ্টা পূর্বে তিনি বলেছিলেন, খুলে দাও জানালার খড়খড়ি, ঢুকতে দাও দিনের আলো। আলো, আরও আলো।

শিশুটির জন্মের পরই তার মায়ের মৃত্যু হয়। এই নবজাতক এতই রুগ্ন ও শীর্ণ ছিল যে, চব্বিশ ঘণ্টাও বাঁচবে না বলে সকলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এই শীর্ণকায় শিশুই বেঁচেছিলেন ৮৪ বছর, বেঁচেছিলেন অনন্য সাহস ও মনোবল নিয়ে। নির্বাসন, কারাদণ্ড, রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজের কোপানল, সব কিছুর বিরুদ্ধেই তিনি আপসহীন সংগ্রাম করেছেন এবং ক্ষুরধার বিদ্রূপ ও তীব্র শ্লেষে জর্জরিত করেছেন পোপ, সম্রাট, পুরোহিত অনেককেই। বয়স যখন ৮৩ তখনও তিনি কর্মচঞ্চল, সজীব, উৎসাহী। কোন মানসিক দৈন্য স্পর্শ করেনি তাঁকে। এই বয়সেই তিনি 'আইরিন' নাটক রচনা সমাপ্ত করেন। চিকিৎসকের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে এই নাটকের অভিনয়ও দেখতে যান তিনি প্রেক্ষাগৃহে। এই মনীষীর নাম ভলতেয়ার। তাঁর শেষ কথা: 'আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।'

দীর্ঘজীবন লাভ করতে হলে নিরলস কর্মসাধনার প্রয়োজন। কর্মের মাধ্যমেই প্রতিভা বিকশিত হয়। কর্মই প্রকৃত জীবন। এই তত্ত্বকথার দিকেই ভলতেয়ার বারবার অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি:—"কোন কাজে নিযুক্ত না থাকা আর বেঁচে না থাকা একই।" "যারা অলস তারা ব্যতীত আর সব লোকই সৎ।" "আমার বয়স যত বাড়ছে ততই আমি উপলব্ধি

করছি জীবনে কাজই প্রয়োজন।" "যদি আত্মহত্যা করতে না চাও তাহলে সব সময়েই কিছু না কিছু কাজ কর।"

ফরাসী সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভিক্টর হুগো (১৮০২-১৮৮৫)। তাঁর বিশ্বখ্যাত 'লে মিসারেবল' প্রকাশিত হয় তাঁর ৬০ বছর বয়সে। ৮০ বছর বয়সেও তিনি সরস কবিতা রচনা করেছেন। "টরকুই মাডা' গ্রন্থ এই বয়সেই তিনি রচনা করেন। অশীতিতম জন্মদিনে বিপুল সাহিত্যকীর্তির জন্য তিনি যে সম্বর্ধনা লাভ করেন সাহিত্যের ইতিহাসে তা বিরল।

ইতালীর সুরশিল্পী গিউসেপি ভার্ডি (১৮১৩-১৯০১) বাল্যকালেই সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় দেন। ৭৪ বছর বয়সে 'ওতেলো' অপেরা রচনা করেন, ৮০ বছর বয়সে 'ফলস্টাফ' এবং ৮৫ বছরে 'আভে মারিয়া' ও 'টি দিউস' রচনা করেন। এই প্রতিভাধর শিল্পীর মৃত্যু হয় মিলানে ৮৭ বছর বয়সে। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত অরকেস্ট্রা পরিচালক টসকানিনিও (১৮৬৭-১৯৫৭) স্মরণীয়। বিস্ময়কর ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি, বিস্ময়কর ছিল তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা।

বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৮-১৭৯০) ৮০ বছর বয়সে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেছেন। রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮), কবি টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২), এইচ জি ওয়েলস (১৮৬৬-১৯৪৬) স্যার অলিভার লজ্ (১৮৫১-১৯৪০) প্রভৃতি দীর্ঘজীবী মনীষীরা জীবনের শেষাঙ্কেও বাণী সাধনায় ব্রতী ছিলেন। টেনিসনের জীবনের শেষ বছরে রচিত 'ক্রসিং দি বার' তো অনবদ্য সৃষ্টি। মনীষী টলষ্টয় বেঁচে ছিলেন ৮২ বছর। তাঁর 'রিসারেকসন' গ্রন্থ রচিত হয় ৭০ বছর বয়সে। 'হোয়াট ইস্ আর্ট' রচনা করেন তিনি ২৮৯৮ সালে। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি তো জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত করে গেছেন।

সারাজীবন কেটেছে তাঁর বিজ্ঞান সাধনায়। ৭০ বছর বয়সেও

তিনি নিজেকে যুবক বলেই মনে করতেন। ৭৫ বছর বয়সে ১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করতেন এবং ৮০ বছর বয়সে আবিষ্কার করলেন 'ফাষ্ট' লং প্লেয়িং গ্রামোফোন'। যুক্তরাষ্ট্রের পেটেণ্ট অফিস থেকে সহস্রাধিক পেটেণ্ট এঁর নামে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। এই বৈজ্ঞানিকের নাম টমাস অলভা এডিসন (১৮৪৭—১৯৩১)। মানব জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতির ইতিহাসে এঁর দান অসামান্য, যুগান্তকারী। অদম্য উৎসাহ, দুর্জয় সাহস ও আত্মপ্রত্যয়, নিরলস কর্মসাধনার ফলেই তিনি এই বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের নব নব সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজেছেন। ৮৪ বছর বয়সে তিনি বলেছিলেন, "আমি আরও ১৫ বছর কাজ করব। ১০০ বছর বয়সেই অবসর গ্রহণ করা উচিত। এই সময়ের পূর্বেই আমার যা কিছু করবার আছে তা শেষ করতে হবে। আপনি জানেন, আমি এখন রবার নিয়ে গবেষণা করছি।" মৃত্যুর বছর পাঁচেক আগে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কখন তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। এর উত্তরে বলে-ছিলেন, 'দি ডে বিফোর দি ফিউনারেল'।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০। বাগানের একটা শুকনো ডাল কাটছেন এক মনীষী। ভারসাম্য হারিয়ে হঠাৎ পড়লেন মাটিতে আর পা গেল মচকে। হাসপাতালে ভরতি করা হলো, হলো অস্ত্রোপচারও। সহাস্যে ডাক্তারকে বললেন, 'এবার যদি বেঁচে যাই তাহলে আপনার তো কোন লাভই হবে না, কারণ ডাক্তারেরা তো খ্যাতিলাভ করেন তখনই যখন তাঁদের চিকিৎসাধীনে থাকার সময় কোন প্রসিদ্ধ লোক মারা যান।' এই মনীষী জর্জ বার্ণার্ড শ; জন্ম ১৮৫৬, মৃত্যু ১৯৫০। অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্য। বার্ধক্য তাঁর প্রতিভার দীপ্তিকে ম্লান করতে পারেনি, হরণ করতে পারেনি তাঁর ক্ষুরধার সজীবতাকে।

স্যার উইনস্টন চার্চিল (১৮৭৪-১৯৫৫) কেবল যে রাষ্ট্রনীতি

ক্ষেত্রেই প্রখ্যাত ছিলেন তা নয়, ঐতিহাসিক রূপেও তিনি সম্মানিত। কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস এবং ইংরেজ জাতির ইতিহাস তাঁর পরিণত বয়সের অনন্য সৃষ্টি। বহু গ্রন্থ-প্রণেতা মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড (১৮৫৬—১৯৩৯) ৪ বছর থেকে ৮২ বছর পর্যন্ত ভিয়েনায় বাস করেন কিন্তু নাৎসী জার্মাণীর অষ্ট্রিয়া আক্রমণের পর লণ্ডনে আশ্রয় নেন। ৮০ বছর বয়সেও তাঁর স্মৃতিশক্তি ব্যাহত হয়-নি, এই বয়সেও তিনি মৌলিক রচনা প্রকাশ করেছেন। মোসেস অ্যাণ্ড মনোথিইসস যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স ৮৩। আমেরিকার দার্শনিক শিক্ষাবিদ ডিউই (১৮৮৯—১৯৫২) অনুরূপ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল ৯৫ বছরে পদার্পণ করেছেন। এই মনীষীর চিন্তাধারা এখনও মৌলিক ক্ষুরধার প্রোজ্জ্বল। বার্ধক্য এখনও তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে স্তব্ধ করতে পারেনি। ব্যক্তিস্বাধীনতার এই পূজারী স্বাধীন মতবাদের জন্য নিগৃহীত হয়েছেন, কারাবরণ করেছেন। তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৫০ সালে। এডিথ ফিঞ্চকে বিবাহ করেছেন ১৯৫২ সালে ৮০ বছর বয়সে।

মহিলাদের মধ্যে মেরি বেকার এড্ডি (১৮২১—১৯১০) স্মরণীয়। তিনি ক্রিষ্টান সায়েন্সের প্রতিষ্ঠা করেন আমেরিকায়। আন্তর্জাতিক দৈনিক সংবাদপত্র দি ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটার যখন প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর বয়স ৮৭ বছর। তিনি মারা যান ৮৯ বছর বয়সে। হেলেন কেলারের (১৮৮০—) কর্মসাধনার তো তুলনা নেই। এই মহীয়সী মহিলা পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্যা।

অশীতি-উর্ধ্ব মনীষীদের মধ্যে পারস্যের কবি ফারদৌসী ও শেখ সাদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৬০ হাজার ছত্রে রচিত ফারদৌসীর সুবিশাল শাহ্‌নামা গ্রন্থ তাঁর অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তি। জীবনের শেষ ভাগেই এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। শেষ করেন ১০১০ খৃষ্টাব্দে। শেখ সাদী শতায়ু ছিলেন। তাঁর বস্তান ও গুলিস্তান

তাঁকে অমর করে রেখেছে। মহাকবি তুলসীদাস (১৫৩২—১৬২৩) বেঁচেছিলেন প্রায় ৯০ বছর। তাঁর সাহিত্যিক জীবন ৪০ বছরের পূর্বে আরম্ভ হয়নি। রামচরিত-মানস তাঁকে চিরস্মরণীয় করেছে। এই সাধকের জীবনেতিহাস বিচিত্র সুন্দর ও ঘটনাবহুল।

অসাধারণ মনীষী ছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনিও ছিলেন শতায়ু। চৈতন্য চরিতামৃত তাঁর অক্ষয় কীর্তি। বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ। জীবনের শেষ ভাগেই তিনি রচনা করেন এই কাব্যগ্রন্থ। জনশ্রুতি, এই বিখ্যাত গ্রন্থ বিষ্ণুপুরের কাছে লুণ্ঠিত হওয়ার সংবাদ যখন তাঁর কাছে পৌঁছয় তখন তিনি মর্মাহত হন। এই শোকেই নাকি তাঁর মৃত্যু হয়।

১২১৪ বঙ্গাব্দে মৃত্যু হল ত্রিবেণীর মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চাননের। বয়স তখন ১১১ বা ১১৩। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর শারীরিক শক্তি প্রায় অক্ষুণ্ণই ছিল, স্মৃতিশক্তি ছিল অটুট। কোন ইন্দ্রিয়ই নাকি হয়নি শিথিল। বার্ধক্য তাঁর মনের সজীবতা নষ্ট করতে পারেনি। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি শাস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন শিষ্যদের, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেছেন দীর্ঘ সময়। ৯৮ বৎসর বয়সে তিনি বিবাদ ভঙ্গার্ণব গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাঁর বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

দাদাভাই নরোজীর জন্ম হয় বোম্বের পার্শি পরিবারে ১৮২৫ সালে, মৃত্যু হয় ১৯১৭ সালে। সারা জীবন তিনি আত্মনিয়োগ করেন শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি ও সাহিত্য সেবায়। 'Grand old man of India'নামেই তিনি সম্মানিত।

রাজাগোপালাচারির জন্ম ১৮৭৯ সালে। শুধু রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রেই তিনি যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, তাঁর পরিণত বয়সের সাহিত্য কৃতিও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আজও তিনি নিরলস, সোচ্চার, প্রতিভা-দীপ্ত।

২৫শে বৈশাখ যে সূর্যের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই সূর্য অস্ত

গেল ২২শে শ্রাবণ। এই বিশ্ববরেণ্য মনীষীর জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার ফলে আমরা পেয়েছি যে বিপুল সম্পদ তার তো তুলনা নেই। তাঁর জীবনসন্ধ্যায় রচিত সাহিত্যও তাঁর কালজয়ী প্রতিভার সার্থক স্বাক্ষর। আরোগ্য, জন্মদিনে, সভ্যতার সঙ্কট, ছড়া, গল্পসল্প, শেষ লেখা—এই সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। কবির কল্পনাশক্তি ও জীবনদর্শন শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, বার্ধক্য তাঁর প্রতিভাকে স্তিমিত করতে পারেনি। মৃত্যুর ১১ দিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে—কে তুমি? মেলেনি উত্তর।…

৩০শে জুলাই অপারেশনের কিছু পূর্বে জীবনদেবতার উদ্দেশে কবি শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করলেন মুখে মুখেই…

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।…

বাংলার দীর্ঘজীবী মনীষীদের মধ্যে কয়েকজনেরই নাম উল্লেখ করছি এখানে। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির কথা বলি। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিল অসাধারণ। জীবনের শেষের দিকে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছিল বটে কিন্তু প্রতিভার দীপ্তি ও জ্ঞানলিপ্সা হ্রাস পায়-নি। আচার্য যদুনাথ সরকারের অশীতিবর্ষ পরেও ইতিহাস সাধনার বিরতি ঘটেনি, তখনও তিনি ইতিহাসের রহস্যময় অতীতে বিচরণ করেছেন। সাংবাদিক মনীষী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে আমরা দেখেছি আশি বছর পরেও ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে, প্রবন্ধ রচনা করতে, স্মৃতি মন্থন করে আহরণ করতে অতীতের মূল্যবান তথ্য ও কাহিনী। বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সাধক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ৪০ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন ১৩৫২ সালে। এটা তাঁর জীবনের কীর্তি-স্তম্ভ। গোপীনাথ

কবিরাজের পাণ্ডিত্য সর্বজনবন্দিত। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে নানা গ্রন্থে, নানা নিবন্ধে। বার্ধক্য তাঁর জ্ঞান-সাধনাকে ব্যাহত করতে পারেনি। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (জন্ম ১৮৮১) এখনও নীরব হননি, ৮২ বছর বয়সেও আমরা তাঁকে দেখেছি সভা-সমিতি অলঙ্কৃত করতে। কবি নরেন্দ্র দেব এ বছর অশীতি বর্ষে পদার্পণ করেছেন। আজও তিনি সৃজনশীল, আজও তাঁর দর্শন মেলে সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙ্গিনায়। এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য।

সঙ্গীত জগতের দিকপাল আলাউদ্দীনের প্রতিভার পরিচয় কারুর অজানা নয়। ১৩৭২ সালে এক সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি বলেন—'নব্বুই বছর ধরে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর দর্শনের আশায় সাধনা করে আসছি। একটি মাত্র আশায় দিনের পর দিন সাধনা করে আসছি—একদিন না একদিন তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে অমরাবতীর সঙ্গীত মন্দিরে ঢোকার অনুমতি দেবেন। আজও আমার সাধনার শেষ নেই।...'

জ্ঞান-সাধনার শেষ নেই। এই সাধনার মধ্য দিয়েই জীবন বিকশিত হোক, নিঃশেষিত হোক, পূর্ণ হোক, এই তো মনীষীদের মর্মকথা। বার্নার্ড শ'এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

"When I die I want to be thoroughly used up. The harder I work the more I live. Life is no brief candle for me. It is a sort of splendid torch which I have got hold of for the moment. I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations."

বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি

ত্রিবেণীর ঘাটে বজরা থেকে নামল দু'জন গোরা সৈনিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মধ্যে বেধে গেল সংঘর্ষ—কথান্তর থেকে হাতাহাতি। তারা শরণাপন্ন হল আদালতের। বিচারক বললেন, সাক্ষী চাই। তারা বলল, 'ধর্মাবতার, সাক্ষী তো আমাদের কেউ নেই, তবে সেই সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সারা অঙ্গে মাটি মেখে গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন সব বলছিল। সেই সব কিছু দেখেছে।' এই ব্রাহ্মণ অন্য কেউ নন, ইনি ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, যাঁর পাণ্ডিত্যের গৌরব তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। বিচারকের অনুরোধে তিনি বললেন, 'ওদের মারামারি করতে দেখেছি, দুজনের সব কথাই শুনেছি কিন্তু ইংরেজী জানি না বলে ওদের কথার মানে বুঝতে পারিনি। তবে কে কি কথা বলেছিল তা সব বলতে পারি।' আশ্চর্য হলেন বিচারক, আরও আশ্চর্য হলেন তিনি যখন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই ঘটনার অবিকল বর্ণনা দিলেন, এমন কি কে কোন শব্দ ব্যবহার করেছিল তাও সঠিক বললেন। এই দীর্ঘজীবী মনীষীর পাণ্ডিত্য ছিল যেমন সুগভীর, স্মৃতিশক্তিও ছিল তেমনি বিস্ময়কর ও অসাধারণ।

আমাদের দেশে কোন কালেই শ্রুতিধর পণ্ডিতের অভাব ছিল না। একবার দু'বার বা তিনবার কোন শ্লোক, কবিতা বা ধর্মগ্রন্থ শুনলেই তা কণ্ঠস্থ করতে পারতেন এমন মনীষীদের বহু বিস্ময়কর কাহিনী অনেকেরই জানা আছে। আজও গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ নির্ভুল আবৃত্তি করতে পারেন এমন লোকের অভাব নেই। 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।' রঘুনাথ শিরোমণির কথাও বিশেষ স্মরণীয়। কথিত আছে, তিনি মিথিলার পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের ছাত্র ছিলেন। শিক্ষাশেষে তিনি তাঁর প্রখ্যাত অধ্যাপকের কাছে

তাঁর প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের টীকা নবদ্বীপে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর গুরু এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। রঘুনাথ এতে কিন্তু বিচলিত হননি। তিনি বিস্তৃত টীকা গ্রন্থটি মুখস্থ করে ফেলেন এবং অপূর্ব স্মৃতিশক্তির বলেই নবদ্বীপে এসে তা লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হন।

ডঃ সুশীল রায় মনীষী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির কাছ থেকে ঘণ্টুলাল নামে এক মহারাষ্ট্রীয়ের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির কাহিনী শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর কথাই উদ্ধৃত করছি, "পাঁচ বছর বয়সে বসন্তরোগে তাঁর দুচোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি পিতামাতার মুখে শাস্ত্রপাঠ শুনতেন, আর একবার শুনেই কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। একবার কটকে তাঁর পরীক্ষা করা হয়। এক আসরে কেউ আবৃত্তি করল ইংরেজি এক লাইনের দুটো শব্দ, ইতিমধ্যে কেউ দিল ঘণ্টায় এক ঘা, কেউ ডুগীতে এক ঘা, তারপর আবার আবৃত্তি ওড়িয়ার এক লাইনের দুটো শব্দ—এই রকম চলল অনেকবার। অবশেষে ঘণ্টুলাল বলে গেলেন কবার বেজেছে ঘণ্টা, কবার ডুগী, ইংরেজি,—বাংলা—ওড়িয়ায় বলা হয়েছে কি কি কথা।"

পাশ্চাত্যদেশেও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী অনেক ব্যক্তির সন্ধান মেলে। Magliabechi (১৬৩৩-১৭১৪) ছিলেন ফ্লোরেন্সের চলমান বিশ্বকোষ। এত বড় গ্রন্থকীট নাকি কখনও জন্মগ্রহণ করে-নি। যা কিছু পড়তেন তাই তাঁর মনে গাঁথা হয়ে থাকত। কোন্ বইয়ের কোন্ পাতায় কি বিষয় পড়েছেন তা তিনি সঠিক বলতে পারতেন। তিনি ছিলেন ডিউক তৃতীয় কসিমোর গ্রন্থাগারিক। Leon Gambetta (১৮৩৮-১৮৮২) ছিলেন ফরাসী রাষ্ট্রবিদ্। বাইবেলের 'বুক অব রুথ' তাঁর আদ্যোপান্ত মুখস্থ ছিল, নির্ভুলভাবেই প্রতিটি শব্দ তিনি আবৃত্তি করতে পারতেন। ভিকটর হুগো ও ওসিয়ানের অনেক গ্রন্থও নাকি তিনি মুখস্থ করেছিলেন। হাজার

হাজার পৃষ্ঠা তিনি শেষের দিক থেকে শুরু করে গোড়া পর্যন্ত আবৃত্তি করতে পারতেন।

ইতালীর কার্ডিনেল Mezzofanti (১৭৭৪-১৮৪৯) ছিলেন বিশ্বের অতি বিখ্যাত শ্রুতিধর। ৫০টা ভাষা শিখেছিলেন তিনি। ইনি ছিলেন রোমের ভ্যাটিকান লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক। একটা ঘটনার কথা বলি। এক সময় দুজন জলদস্যু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মৃত্যুর পূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তিদের তাদের মাতৃভাষায় পাপ স্বীকার করানোর ভার পড়ে তাঁর ওপর, কিন্তু দস্যুদের মাতৃভাষা তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য, একদিনের মধ্যেই তাদের ভাষা শিখে নিয়ে পরের দিন তাদের ভাষাতেই তাদের অন্তিমকালের বাসনা পূর্ণ করেন।

Eliza of Vilna ছিলেন লিথুনিয়ার ইহুদী পাদ্রী। অসাধারণ ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য ও স্মৃতিশক্তি। একবার কোন বই পড়লে তিনি কখনও তা ভুলে যেতেন না। গোটা বাইবেলটাই নাকি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল; যে কোন অংশই নাকি তিনি আবৃত্তি করতে পারতেন। Woodfall (১৭৪৫-১৮০৩) ছিলেন মর্নিং ক্রনিকেল পত্রিকার সম্পাদক। কোন নোটের সাহায্য না নিয়েই নির্ভুলভাবে সংবাদ রিপোর্ট করতেন। ইনি 'Memory Woodfall' নামে খ্যাতিলাভ করেন। রিচার্ড পরসন মিলটনের কাব্যগ্রন্থ থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন, এমন কি শেষ থেকে শুরু করে গোড়া পর্যন্ত।

মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) ছিলেন গ্রন্থকীট। তাঁকে বলা হত 'he is like a book in breeches.' তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। যা কিছু পড়তেন তার বেশির ভাগই গাঁথা থাকত মনে। তিনিই তো বলেছিলেন, মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' যদি জগৎ থেকে বিলুপ্ত হয় তাহলে তিনি স্মৃতি থেকেই উদ্ধার করে দিতে সক্ষম। বই লেখার সময় তিনি অভিধান, নোটস্ প্রভৃতির সাহায্য না নিয়েই পাতার পর পাতা লিখে যেতেন।

বহু গ্রন্থ-প্রণেতা অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির (১৮৯৩-১৯৫০) স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর। তিনি যখন রাষ্ট্রনীতির সম্বন্ধে কোন বক্তৃতা দিতেন তখন কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোন চিন্তা না করেই বলতেন, ব্রাইসের কমনওয়েলথ গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখুন অথবা বলতেন, টাইমস্ পত্রিকার ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ সালের সংখ্যা দেখুন, আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন। অনেক শ্রোতাই ভাবত লাস্কি হয়তো তাদের ভাঁওতা দিচ্ছেন। কিন্তু শ্রোতারা যখন তাঁর উক্তি বই ও পত্রিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখত তখন তাদের বিস্ময়ের সীমা থাকত না। সব ক্ষেত্রেই লাস্কির রেফারেন্স নির্ভুল।

বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের স্মৃতিশক্তির সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। শ্যামাপূজার দিন এক সন্ন্যাসীর শুভাগমন ঘটে তাঁদের বাড়িতে। দেবীর সামনে তিনি ১০৮টি ভক্তিমূলক স্তব পাঠ করেন। এই মধুর কবিত্বপূর্ণ শ্লোকগুলি তিনি মুখে মুখেই রচনা করেন। স্তবপাঠ শেষ হলে সকলেই তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কিন্তু শ্লোকগুলি কেউই লিখে নেননি বলে তিনি বিশেষ দুঃখিত হন। বালক বাণেশ্বর তাঁর পাশেই ছিল; মন দিয়েই সে শুনেছিল তাঁর স্তবপাঠ। সন্ন্যাসীর কথা শুনে সে বললে, 'আমি আপনার শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছি।' এই বলে সে শ্লোকগুলি অবিকল আবৃত্তি করে সকলকে শুনিয়ে দিল। বালকের বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে সন্ন্যাসীর আনন্দের সীমা রইল না।

বিশ্বের বিচিত্র বই

আজকের দিনে বইয়ের প্রাচুর্য বিস্ময়কর। বিষয়-বৈচিত্র্যে, অঙ্গ-সৌষ্ঠবে, মুদ্রণপারিপাট্যে বই আজ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছুতে কেটেছে অনেক শতাব্দী, আর লেগেছে সুদীর্ঘকালের শ্রম, চিন্তা এবং সাধনা। মাটি কাঠ পাথরের ওপর আঁচড় কেটে মানুষ লিখেছে নানা ছাঁদের চিত্রাক্ষর। প্যাপিরাস শীট ভূর্জপত্র আর তালপাতার ওপর লিখেছে অনেক আশ্চর্য সুন্দর লিপি। চামড়ার ওপরও লিপিবদ্ধ করেছে অনেক কথা এবং কাহিনী। তুলি আর রং দিয়েও এঁকেছে ছবি, চিত্রিত করেছে পুঁথি, অলংকৃত করেছে নানা বর্ণাঢ্য রূপরেখায়। যুগে যুগে এমনি করেই মানুষ লিপিবদ্ধ করে গেছে সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, আরও কত কি। এরপর এসেছে মুদ্রাযন্ত্রের যুগান্তকারী আবিষ্কার। যা ছিল দুর্লভ তা হয়েছে সুলভ। জ্ঞানবিজ্ঞানের মধুভাণ্ড আজ অবারিত। বইয়ের ইতিহাস সভ্যতার ক্রমবিকাশেরই ইতিহাস। এই ইতিহাস থেকেই বিশ্বের কিছু বিচিত্র বইয়ের কথা বলছি এখানে।

৩০ হাজার মাটির ফলক

শতাধিক বৎসর পূর্বের কথা। নিনেভ শহরের ভগ্নস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত হল রাশি রাশি মাটির টালি। বিস্ময়কর এই আবিষ্কার। আসুরবানিপাল ছিলেন আসিরীয়ার পরাক্রান্ত রাজা, নৃশংস কিন্তু বিদ্যোৎসাহী। তিনি বলে গেছেন, "আমি শত্রুদের নাক কান কাটি বটে, কিন্তু আমি বই পড়ি।" তাঁর বিশাল গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল এই সব মাটির ট্যাবলেট—৩০ হাজার মাটির ফলক। গ্রন্থাগারটি ছিল সুবিন্যস্ত, অনেকটা আধুনিক গ্রন্থাগারের মত। ক্যাটালগও ছিল এই লাইব্রেরীতে। সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মপুরাণ, অভিধান,

এমন কি স্কুলপাঠ্য বিষয়ও লিপিবদ্ধ আছে এসব মাটির ফলকে। 'দি এপিক অব গিলগামিস' এইরূপ কয়েকটি ট্যাবলেটেই লিখিত হয়। এই ট্যাবলেটগুলি আবিষ্কারের ফলে আসিরীয়া ও ব্যাবিলনের প্রাচীনতম ইতিহাসের সন্ধান মিলেছে।

রসেটা স্টোন

নেপোলিয়ন তখন মিশর দেশে। সঙ্গে তাঁর পুরাতত্ত্ব-অনুরাগী কয়েকজন সৈনিক। এঁদের মধ্যেই একজন ১৭৯৮ সালে রসেটার নিকট হঠাৎ একটা কালো পাথর আবিষ্কার করেন। এই প্রস্তরখণ্ড ৪ ফুট লম্বা ও ২ ফুট চওড়া। পাথরটার যে অংশটুকু মাটির ওপরে ছিল তার ওপর লেখা ছিল তিন প্রকার বিচিত্র লিপি। নেপোলিয়নের স্যেন দৃষ্টি পড়ে এই প্রস্তর-খণ্ডের ওপর। তাঁর আদেশে লিপিগুলো নকল করে পাঠানো হয় ইউরোপের পণ্ডিতদের কাছে। পাথরটাকে আনা হয় ফ্রান্সে। কিন্তু কেউ পারে না এইসব লিপির অর্থ উদ্ধার করতে। শেষে শাম্পোলিওঁ নামে এক পণ্ডিত ২০ বছর প্রাণপাত পরিশ্রম করে এই দুরূহ লিপিগুলোর মর্মোদ্ধার করেন। এই প্রস্তরখণ্ড Rosetta Stone নামে অভিহিত। ব্রিটিশ মিউজিয়মের মিশরীয় সংগ্রহশালায় এই বিচিত্র পাথরটি রক্ষিত আছে। এই স্মরণীয় আবিষ্কারের ফলে মিশরের ইতিহাস আজ আর রহস্যাবৃত নয়। এই প্রসঙ্গে অশোকের শিলালিপি ও হামুরাবাইয়ের 'কোড অব লজ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চামড়ার বই

অতীতে বই লেখা হয়েছে চামড়ার ওপর। বাছুর, ছাগল, ভেড়া, গাধা, শেয়াল ও হরিণের চামড়া তো ব্যবহৃত হয়েছেই, এমন কি সাপের চামড়াও হয়তো বাদ পড়েনি। বই বাঁধাতে চামড়ার প্রয়োজন আজও আছে। মিশর দেশে খ্রীষ্টপূর্ব দু' হাজার বছর আগে

চামড়ার ওপর বই লেখা হত। হিব্রুরা তো চামড়া ব্যবহার করতই। ১৯৪০ সালে এক বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়। ডেড্ সির ধারে মাটির পাত্রে চামড়ার ওপর লেখা বহু রোল পাওয়া যায়। এই সব রোলে বাইবেলে বর্ণিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। রচনাকাল প্রথম শতাব্দী বলেই অনুমান করা হয়। চামড়ার এই রোলগুলির নাম দেওয়া হয়েছে Dead Sea Scrolls.

চামড়াকেই পরিষ্কার করে তৈরি হত পার্চমেণ্ট। বাছুর, ভেড়া, ছাগলের গাত্র চর্মকে নানা প্রক্রিয়ার সাহায্যে লোমশূন্য ও মসৃণ করে লেখার কাজে ব্যবহার করা হত। এই পার্চমেণ্টের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে। এক সময় মিশরে পঞ্চম টলেমি ও এসিয়া মাইনরের পারগামেনাসের রাজা দ্বিতীয় ইউমেনাসের সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। পাছে পারগামেনাসের গ্রন্থাগার আলেকজেণ্ড্রিয়ার গ্রন্থাগারকে টেক্কা দিয়ে বড় হয়ে ওঠে সেই জন্যই মিশরের রাজা তাঁর দেশ থেকে প্যাপিরাস রপ্তানী একেবারে বন্ধ করে দেন। এতদিন লেখার জন্যে প্যাপিরাস ছিল অপরিহার্য, কাজেই বিপন্ন বোধ করলেন রাজা ইউমেনাস। কিন্তু তিনি দমলেন না। তিনি পার্চমেণ্ট তৈরি করিয়ে লেখার ব্যবস্থা করলেন। প্যাপিরাসের স্থানে দেখা দিল পার্চমেণ্ট। প্যাপিরাসের চেয়ে চামড়া বেশী শক্ত, টেকসই। কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই পার্চমেণ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রোমের বাজারেও পার্চমেণ্ট দেখা দেয়। এর জন্মস্থান পার্গামেনা থেকেই ইংরেজী পার্চমেণ্ট কথাটির উদ্ভব হয়েছে। এইসব পার্চমেণ্ট প্রধানত ভেড়া ও বাছুরের চামড়া থেকেই তৈরি হত। বাছুরের চামড়া থেকে তৈরি পার্চমেণ্টকে বলা হয় ভেলাম।

প্যাপিরাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি একটু আগেই। মিশর ও সুদান অঞ্চলের নদীর তীরে তীরে প্রচুর চাষ হত এই গাছের। এর উচ্চতা ১২ ফুট পর্যন্ত। প্যাপিরাসের শীটে লিখিত ও চিত্রিত বহু

বিচিত্র বই পাওয়া গেছে নানা স্থান থেকে। প্রাচীন মিশরের একটি উল্লেখযোগ্য বই 'The Book of the Dead।' এই বই রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মৃতদেহের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হত। পিরামিডের ভেতর থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার বই পাওয়া গেছে। আর একটি বিখ্যাত বই—The Precepts of Ptah—hotep. প্যাপিরাসের শীটে লেখা অতি প্রাচীন গ্রন্থ।

প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ

পূর্ব তুর্কীস্থানের মরুভূমি অঞ্চল থেকে বহু দুর্লভ পুঁথিপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। নানা ভাষায় লিখিত পুঁথি—সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতীয়, ইরাণী। ডঃ Aurel Stein ১৯০৭ সালে খননকার্যে ব্যাপৃত থাকার সময় টান হুয়াঙ শহরের কাছে Cave of Thousand Buddhas-এ রক্ষিত একটি মহামূল্য বই আবিষ্কার করেন। এটি একটি বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ। ইংরেজিতে বলা হয় Diamond Sutra। এই সূত্রগ্রন্থটি পৃথিবীর প্রাচীনতম মুদ্রিত বই। মুদ্রিত হয় ১১ই মে ৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। মুদ্রাকর উইং চিয়ে। পিতার স্মৃতিরক্ষার জন্য ইনি বইটা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। বইটি এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত। এই গ্রন্থের একটি প্লেটে দেখা যায় শাক্যমুনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দেবতা ও সন্ন্যাসী পরিবেষ্টিত। ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করছেন এক বয়োবৃদ্ধ শিষ্যের সঙ্গে। বইটির সম্বন্ধে কার্টার বলেন—

"The book consists of six sheets of text and one shorter sheet with woodcut, all neatly pasted together so as to form one continuous roll sixteen feet long. Each sheet is two and a half feet long by nearly a foot wide indicating the large size of the blocks."

দুর্লভ বই : দামী বই

অনেক দুর্লভ, পুরাতন বই অবিশ্বাস্য মূল্যে বিক্রিত হয়। নীলামে আকাশ-ছোঁয়া দর ওঠে। যাদের বই কেনার বাতিক আছে, যারা বই-পাগল তাদের তো কথাই নেই, যে কোন মূল্যেই তারা দুষ্প্রাপ্য বই কেনে। জাতীয় গ্রন্থশালা, মিউজিয়ামও এইসব গ্রন্থ বহু অর্থব্যয় করে সংগ্রহ করে।

চতুর্থ শতাব্দীর একটি নিউ টেস্টামেণ্টের পুরাতন কপি Codex Sinaiticus. এটি পাওয়া যায় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সিনাই পর্বতের এক কনভেণ্টে। ব্রিটিশ মিউজিয়াম এই পুঁথিটি ১০০,০০০ পাউণ্ড দিয়ে ক্রয় করে। কোরানের একটি হস্তলিখিত গ্রন্থ আফগানিস্থানের রাজা উপহার দিয়েছিলেন পারস্যের শাহ্‌কে। এই গ্রন্থটির শুধু বাঁধাই খরচই লেগেছিল ৩০ হাজার পাউণ্ড। একে শ্রীমণ্ডিত করতে ১৬৭ মুক্তা, ১৩২ চুনি, ১০৯ সেরা জাতের হীরা এবং ৩৯৮টি রত্ন ব্যবহৃত হয়েছিল। বার্লিন শহরের এক নীলামঘরে ১৯৩০ সালে Mazarin Bible-এর একটা কপি বিক্রিত হয় ৬৫ হাজার পাউণ্ডে। শেকস্‌পীয়রের প্রথম ফোলিও এক ভদ্রলোক ৫২৫০ পাউণ্ডে ক্রয় করে ব্রিটিশ মিউজিয়মকে দান করেন। লা ফণ্টেনের ছোট একটা বিচিত্রিত গল্পের বইয়ের এক কপি নীলামে ২,০০০০০০ ফ্র্যাংকে বিক্রিত হয়েছিল। মধ্যযুগে বইয়ের মূল্য ছিল অনেক। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে লিভির এক পুঁথি ১২০টি স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রিত হয়। এই অর্থ দিয়ে সেকালে বড় একটা জমিদারী কেনা যেত। এণ্টোনিয়াস বেকার্টিলাস নামে এক ভদ্রলোক তো লিভির একখানা পুঁথির জন্য তাঁর ভদ্রাসনটাই বেচে দেন। Gutenburg Bible-এর ২০০ কপি ছাপা হয়, এর মধ্যে ১২টি মুদ্রিত হয় চামড়ার ওপর। চামড়ার ওপর মুদ্রিত তিনখানি বইয়ের দাম এখন ৩০০,০০০ ডলার।

জাপানী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উপন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় যা সম্ভবত বিশ্বের অতি বৃহৎ গ্রন্থ বলে দাবী করতে পারে। উপন্যাসটির নাম Genji Monogaturi, এর রচয়িতা এক নারী, নাম মুরাসাকি। ৫৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিপুলায়তন উপন্যাসের পৃষ্ঠা-সংখ্যা হচ্ছে ৪২৩৪। কেবলমাত্র গ্রন্থের পাত্রপাত্রীদের তালিকা লিপিবদ্ধ করতেই লেগেছিল ৮০ পৃষ্ঠা। প্রায় হাজার বছর আগে লিখিত এই গ্রন্থটি প্রাচীন জাপানের একটি বাস্তব জীবনালেখ্য বলেই গণ্য হয়।

এক বিশাল আয়তনের অভিধান রচিত হয়েছিল চীনদেশে। মিকাডোর আদেশে মুদ্রিত হয় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে। এই চীনা অভিধান ৫০২০ খণ্ডে বিভক্ত, প্রতি খণ্ডে ১৭০ পৃষ্ঠা। স্পেনের গির্জাতে এমন সব বই আছে যা দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট, প্রস্থে ৫ ফুট। ভিয়েনার স্টেট টেক্‌নিকাল স্কুলে একটা অ্যানাটমির এটলাস আছে। ছাপতে লেগেছিল পাঁচ বছর। লিওনার্ড থিওডোর সাম্প্রতিককালের একটি বিস্ময়কর সংবাদ জানিয়েছেন। ১৯২৫ সালে নিউ-ইয়র্কের যে বিরাট শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে এক বিচিত্র বই প্রদর্শিত হয়। বইটির নাম 'The Story of the South.' দানবাকৃতি বই। দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি, বেধ ১২ ইঞ্চি। এর পাতা ওলটাবার জন্য ১২ 'হর্স পাওয়ারে'র একটা ইঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। এই বইয়ের ওজন ছিল ¾ টন। একটা বড় ষাঁড়ের সব চামড়াটাই লেগেছিল এই বই বাঁধাবার জন্যে। প্রকাশক রেমিংটন কোম্পানী। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের সামুয়েল রিচার্ডসন রচিত Clarissa Harlowe উপন্যাসটিরও উল্লেখ করতে হবে। এগার মাসের ঘটনাবলীর বিবরণ দিতেই গ্রন্থকার ব্যবহার করেছেন ৯৮৪৮৭০ শব্দ। মাডাম স্কুডারির 'Grand Cyrus' গ্রন্থটিও সুবৃহৎ। ইনি ১,৮০০,০০০ শব্দ ব্যবহার করেছেন এই উপন্যাসে।

আয়তনে, বিষয়-গৌরবে, প্রাচীনত্বে মহাভারতের তুলনা নেই। পৃথিবীর কোন দেশেই মহাভারতের মত এত বৃহৎ মহাকাব্য রচিত হয়নি। তুলসীদাসের রাম-চরিতমানস্ সুবৃহৎ মহাকাব্য। মহাভারত ও রামায়ণের সঙ্গে ইলিয়ড ও ওডিসি গ্রন্থেরও তুলনা হয় না।

ছোট বই

বৃহদাকার বই যেমন যুগে যুগে লিখিত হয়েছে তেমনি হয়েছে ক্ষুদ্র আয়তনের বই। Thumb Bible-এর কথাই বলি। এটা প্রকাশিত হয় ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে, এবারডিন্ শহরে। এর আয়তন একটা ডাকটিকিটের মত। অন্য একটা বাইবেল মুদ্রিত হয় গ্ল্যাসগো শহরে, ১৯০১ সালে। মলাট বাদ দিয়ে এটা হচ্ছে ১$\frac{1}{8}$ × ১৩/৮ ইঞ্চি, বেদ ৭/১৬ ইঞ্চি, পৃষ্ঠাসংখ্যা অনেক। এর সঙ্গে আবার কয়েকটা ছবিও আছে। ছোট ছোট অক্ষরগুলো পড়বার জন্য একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসও জুড়ে দেওয়া হয়েছে এর সঙ্গে। পাদুয়া শহরে ১৮৯৭ সালে ছাপা হয় একটা বই, ২০৮ পৃষ্ঠার বই। এর মধ্যে আছে গ্যালিলিও কর্তৃক লিখিত এক মূল্যবান চিঠি। জর্জ মাস বলেছেন, তিনি এক সময় এক কোরানগ্রন্থ দেখেন। সেটা ছিল পার্চমেণ্টে ৪ × $\frac{1}{2}$ ইঞ্চির মধ্যে। অন্য একটি ক্ষুদ্র বইয়ের কথাও জানা গেছে। বইটার পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০। অতি প্রাচীনকালেও ক্ষুদ্র বই লেখা হত। সিসেরো বলেন গোটা ইলিয়ড গ্রন্থটা এমন ক্ষুদ্রাকৃতি অক্ষরে লেখা হয়েছিল যে তা বড় একটা বাদামের খোসার মধ্যে পুরে দেওয়া যেত। আকবরের দরবারে হস্তলিপিবিদ্ ছিলেন খোজা আবদুস সামাদ। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও হাতের কৌশল এমনই অসাধারণ ছিল যে তিনি নাকি কোরানের একটি অধ্যায় একটা পোস্তদানার ওপর লিপিবদ্ধ করেন।

সেকালের অনেক মুদ্রিত বাইবেলে প্রিন্টার্স ডেভিলের সাক্ষাৎ মেলে, মুদ্রণ-প্রমাদের বিস্ময়কর নিদর্শন পাওয়া যায়। ছাপার ভুলের জন্যই এইসব বাইবেলকে বিচিত্র নামে নামাঙ্কিত করা হয়। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে বার্কার ও লুকাস এক বাইবেল প্রকাশ করেন। এই মুদ্রিত গ্রন্থে 'not' কথাটি বাদ পড়ে যায়। মুদ্রিত হয়, 'Thou shalt commit adultery', কি সর্বনাশ! ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এমন মারাত্মক ভুল! সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, মুদ্রকদ্বয় লাঞ্ছিত হন, বইগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়।

হাজার দুই পাউণ্ড জরিমানা দিয়ে তাঁরা রেহাই পান। এই সর্বনেশে ভুলের জন্যই বাইবেলটাকে বলা হয় The Wicked Bible।

সে এক বিরাট ব্যাপার। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ সর্বজনগ্রাহ্য এক বাইবেল সম্পাদন করতে ৫৪ জন গুণী-জ্ঞানীদের নিযুক্ত করেন। এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয় ১৬১১ খৃষ্টাব্দে। শব্দ ব্যবহৃত হয় ছ হাজার, তার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই এক সিলেবলের। কিন্তু তা হলে কি হয়, এই পরিশ্রম-ধন্য গ্রন্থেও ভুল দেখা যায়। এক অধ্যায়ে নারী সম্বন্ধে বলা হয় 'and he went into the citie' দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্য 'হি'-এর পরিবর্তে 'সি' ছাপা হয়। কিন্তু এই দুটো সংস্করণ 'He Bible' আর 'She Bible' নামেই চিহ্নিত হয়ে যায়। এখানেই শেষ নয়। 'শি' বাইবেলের এক স্থানে 'জুদাসে'র জায়গায় 'জিসাস্' ছাপা হয়ে যায়। বাইবেলের ১৫৬২, ১৫৭৭ ও ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দের সংস্করণগুলোতে এত ভুল ছাপা হয় যে টমাস্ ওয়ার্ড এইসব ভুল সংশোধন করে একটা বইই লিখে ফেলেন। এই বইটির নাম "Errata of the Protestant Bible"।

অন্য একটি অমার্জনীয় ভুল ছাপা হয় কেম্‌ব্রিজ প্রেসে মুদ্রিত ১৬৫৩ সালের বাইবেলে। এখানে সেন্ট পল বলছেন—

"Know ye not that the Unrighteous shall inherit the kingdom of God."

এই ভুলের জন্য বইটাকে বলা হয় Unrighteous Bible। সেকালের একটি মুদ্রিত বাইবেলে দেখা যায়, ডেভিড্‌ বিলাপ করে বলছেন, "the printers have persecuted me." এখানে 'প্রিন্টার্স' হবে না, হবে 'princes.'। এমনি অনেক বিচিত্র ভুল ছড়িয়ে আছে সেকালের মুদ্রিত বাইবেল গ্রন্থে।

চিত্র-বিচিত্র বই

রং তুলি লেখনীর সাহায্যে বইকে যে চিত্র-সমৃদ্ধ বর্ণোজ্জ্বল করা যায় এবং অপূর্ব সুন্দর করে তোলা যায় তার পরিচয় মেলে নানা দেশের বহু অলঙ্কৃত পুঁথি-পুস্তকে। তালপাতায় লেখা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি শাস্ত্রের বহু বর্ণাঢ্য অঙ্গসৌষ্ঠব সেকালের লিপিকরদের বিস্ময়কর ধৈর্য ও কুশলতার স্বাক্ষর বহন করে। পালযুগের দেবনাগরী অক্ষরে লেখা অনেক পুঁথির উল্লেখ করা যেতে পারে। তালপাতায় লেখা দ্বাদশ শতাব্দীর 'অষ্টাসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' বোম্বাইয়ের প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এটি অলঙ্কৃত পুঁথি। রামায়ণ মহাভারত ও প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মের অনেক বিচিত্র ও অলঙ্কৃত পুঁথি নানা দেশের সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের চিত্রিত পুঁথি পাওয়া গেছে ভারতের বহু স্থানে। দিগ্‌দর্শন হিসাবে মাত্র কয়েকটির কথাই বলা হল এখানে।

মোগল যুগের লিপিকর ও চিত্রকরদের অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর আছে তাঁদের লিখিত, চিত্রিত ও অলঙ্কৃত বহু গ্রন্থে। আকবরের ছত্রছায়ায় যে ১৭ জন চিত্রকর খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে

১৩ জন ছিলেন হিন্দু। বসাওন ও দশওয়ান্ত ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। আবুল ফজল বলেন, সে যুগে এই চিত্রশিল্পীদের সমকক্ষ কেউই ছিলেন না। এইসব শিল্পী পশুপক্ষী প্রাকৃতিক দৃশ্য নানা ঘটনা তাঁদের তুলি ও লেখনী দিয়ে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত করেন। আকবর হস্তলিপি-বিশারদদের খেতাব দিয়ে সম্মানিত করতেন। আবহুস সামাদ খেতাব পান 'সিরিন (মধুর) কলম', কাশ্মীরের মহম্মদ হোসেন পান 'জারিন (সোনা) কলম'।

মোগল যুগের এইসব অলঙ্কৃত গ্রন্থের মধ্যে বাবরনামা, আকবরনামা, দেয়ান-ই-হাফিজ, আনওয়ার-ই-সুহালি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়মে এক কপি আকবরনামা আছে। এটা ছিল মোগল সম্রাটদের পারিবারিক গ্রন্থ, বহু চিত্রে সুশোভিত নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল।

বইয়ের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য বাড়াবার জন্য সেকালে বইকে খচিত করা হত বহুমূল্য মণিমুক্তা দিয়ে। সোনা, রূপা, আইভরি তো ব্যবহৃত হতই। বই বাঁধাও হত বহুমূল্য চামড়ায়, পার্চমেণ্টে, সোনার পাতে। আবরণ, আভরণ ছিল বর্ণাঢ্য। এইজন্যই জেরোম তিরস্কারের সুরে বলেছিলেন—

"Your books are overloaded with precious things, whereas Christ died naked outside His temple."

শিকলে বাঁধা বই

বই চুরি যে আধুনিক ব্যাধি তা নয়, অতীতেও বিলক্ষণ চুরি হত বই। মধ্যযুগে দামী ও দুষ্প্রাপ্য বই বিশেষত ধর্মগ্রন্থই চুরি হত বেশি। গির্জা থেকে প্রায়ই বাইবেল অদৃশ্য হত। সেইজন্য অনেক গির্জায় বাইবেলকে বেঁধে রাখা হত। মলাটের কোণ এপিঠওপিঠ ফুঁড়ে সেই গর্তের মধ্যে শক্ত চেন ঢুকিয়ে বইকে লোহার রডে বা

শেলফের সঙ্গে আটকে রাখা হত। এমন শক্ত করে শৃঙ্খলিত করা হত বাইবেলকে যে, কেউই অপসারিত করতে পারত না তাকে। শিকলে-বাঁধা বইয়ের একটা লাইব্রেরী আজও আছে হিয়ারফোর্ডের সেণ্টস্ চার্চে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে এই গ্রন্থাগারে সারি সারি চেনে-বাঁধা বই রক্ষিত আছে। বডলিন গ্রন্থাগারেও এমন অনেক বই আছে যাদের মলাটে দেখা যায় গর্তের চিহ্ন। এক সময় বইকে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখা হত তারই প্রমাণ এই গর্তগুলো।

রক্তে লেখা বই

বই তো লেখা আর ছাপা হয় কালিতে। কিন্তু রক্ত দিয়ে বই লেখা? শরীরের তাজা রক্ত দিয়ে পাতার পর পাতা লিখে যাওয়া? এও কি সম্ভব? লিওনার্ড থিওডোর কিন্তু রক্ত দিয়ে বই লেখার এক বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৫৪ সালে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কয়েকখণ্ড বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র নকল করেন। তাঁকে লিখতে হয় ৬০ হাজার অক্ষর। এই কাজ করতে তাঁর লাগে ১০ কোয়ার্ট রক্ত। প্রতিদিন নিজের শরীর থেকে একটু একটু করে রক্ত নিয়ে তিনি এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেন। প্রথমে মাথা থেকে, পরে আঙুলের ডগা থেকে রক্ত টেনে নিয়ে তাঁর এই রক্তে লেখা গ্রন্থ শেষ করেন।

একটি আশ্চর্য বই

শিরাজের প্রায় মাইল দুই দূরে কবি হাফেজের সমাধিমন্দির। চারিদিকে তার উদ্যান, সৃষ্টি হয়েছে এক রমণীয় পরিবেশ। এখানেই রক্ষিত আছে হাফেজের একখানি কারুকার্য-খচিত সুন্দর গ্রন্থ। এই গ্রন্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা দীর্ঘদিনের সংস্কার। দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক এই সমাধিমন্দিরে এসে এই গ্রন্থের পাতা খোলেন। তাঁদের প্রশ্নের উত্তর খোঁজেন। যদি কেউ শুদ্ধ চিত্তে সংযত মনে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় তাহলে চোখ বুজে এই গ্রন্থের যে

পৃষ্ঠা সে প্রথম খুলবে সেই পৃষ্ঠায় সে উত্তর খুঁজে পাবে। মরমী কবি সুফি বলেছেন, "মর্তের লোকেও আকাশের সংবাদ দিয়ে থাকে, অতএব হাফেজের ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস কর।" নাদির শা নাকি বাগদাদ ও ওরবেজ আক্রমণ করার আগে হাফেজের গ্রন্থ খুলেছিলেন।

১৯৩২ সাল। রবীন্দ্রনাথ গেছেন পারস্য ভ্রমণে। বিপুল সমাদর পাচ্ছেন তিনি এই আতর-গোলাপের দেশে। শুনলেন তিনি হাফেজের গ্রন্থের কথা আর সে দেশের লোকের বিশ্বাস। সমাধি-মন্দিরে গিয়ে চোখ বন্ধ করে তিনি এই গ্রন্থের এক পৃষ্ঠা খোলেন। যে পাতা খোলেন সেখানে যে কবিতা লেখা ছিল তার কিছু অংশ এই: "স্বর্গদ্বার যাবে খুলে, আর সেই সঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি এও কি সম্ভব হবে? অহঙ্কৃত ধার্মিক নামধারীদের জন্যে যদি তা বন্ধই থাকে তবে ভরসা রেখো মনে ঈশ্বরের নিমিত্তে তা যাবে খুলে।" রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল ভারতের মুক্তিকামনা, সেই প্রশ্নেরই তিনি উত্তর চেয়েছিলেন এই গ্রন্থ থেকে। পেয়েছিলেন তিনি শুভ ইঙ্গিত।

মানদ্বন্দ্ব

ভারত ও রোমের মধ্যে তখন চলেছে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রদূত বিনিময়, নানা উপহার উপঢৌকনের আদান-প্রদান। রোম নগরীতে আমদানী হচ্ছে ভারতের রেশম, মশলা, সুগন্ধি, মণিমুক্তা। এমন কি ভারতের হাতী ও বাঘও বাদ পড়ছে না। দুই দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

এই সময়েই হারমিস নামে ভারতের এক অদ্ভুত-দর্শন বালকের কথা জানা যায়। সে ছিল বাহুহীন। তার হাত ছিল না বটে, কিন্তু সে পায়ের সাহায্যেই বিচিত্র ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে রোমের অগণিত নরনারীকে মুগ্ধ করে। ভারতের মহামান্য সম্রাট একটা কাকাতুয়াও পাঠান রোমে। এই পাখীটার ছিল কথা বলার অদ্ভুত শক্তি। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এনেছিল তাকে রোম নগরীতে। রোম সম্রাটকে সে অভিনন্দন জানাত "Hail Caesar, Father of the Country" বলে।

এ-সব হচ্ছে হাজার দুই বছর আগের কথা। তখন রোম সম্রাট অগাস্টাসের রাজত্বকাল। রোমের কীর্তিমান রাজা অগাস্টাস। এই সময়েরই একটি বিচিত্র ঘটনা, একটি ভারতীয় হস্তীর সঙ্গে এক গণ্ডারের যুদ্ধের কথা বলছি এখানে।

রোম নগরীর বিখ্যাত অ্যামফিথিয়েটার। এখানে অগণিত দর্শক উপভোগ করে মল্লযুদ্ধ, ক্রীড়াকৌতুক, জীবজন্তুর লড়াই। নানা রোমাঞ্চকর করুণ নৃশংস দৃশ্য। এই বিশাল প্রাঙ্গণেই একদিন এক ভারতীয় হস্তীকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হল ভীষণ-দর্শন এক গণ্ডারের সঙ্গে। এই অভূতপূর্ব লড়াই দেখতে সেদিন এসেছিলেন রোম সম্রাট অগাস্টাস, এসেছিলেন বহু অভিজাত বংশের সম্ভ্রান্ত নরনারী আর রাজপরিবারেরও অনেকেই। লোকারণ্য হয়েছিল অ্যামফিথিয়েটার। জীবজন্তুর লড়াই সম্বন্ধে যারা আগ্রহশীল, যারা

বিশেষ অভিজ্ঞ, তাদের অনেকেই বাজিও ধরেছিল এই উপলক্ষ্যে। তাদের ধারণা ছিল গণ্ডারই এই যুদ্ধে জয়ী হবে, হাতীর সাধ্য নেই তাকে ঘায়েল করে। কেননা, গণ্ডারের চামড়া পুরু, তার দুর্ভেদ্য দেহ-বর্ম ভেদ করা তো হাতীর সাধ্যে নেই। এছাড়া গণ্ডারের আছে লম্বা ধারাল শিং, তাই দিয়ে সে সহজেই হাতীকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে, তার জীবনান্ত ঘটাবে। এমনি অনেক আলোচনা চলছে কৌতূহলী জনতার মধ্যে। আফ্রিকার বন-জঙ্গলে গণ্ডাররাই তো আধিপত্য করে, আর তাদের ভয়ে হাতীগুলো তো তাদের ত্রিসীমানায় আসে না। এ যুক্তি দেখিয়েও অনেকে বলেছিল, হাতীটারই পরাজয় নিশ্চিত।

ধীর মন্থর পদক্ষেপে, নিঃশঙ্ক চিত্তেই হাতীটা প্রবেশ করল প্রাঙ্গণে। গণ্ডারটাও এসে দাঁড়াল মুখোমুখি হয়ে। লড়াই মুহূর্ত মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে। উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে দর্শকেরা লড়াই দেখবার জন্যে। এমন লড়াই তো তারা পূর্বে কখনও দেখেনি।

লড়াই শুরু হল। হাতীটাই প্রথমে আক্রমণ করল গণ্ডারকে। বেশ কয়েকবার নানা উপায়ে তাকে ঘায়েল করবার চেষ্টা করল, কিন্তু গণ্ডারের পুরু চামড়া প্রতিহত করল তার সকল আক্রমণকে। কোন মারাত্মক আঘাত দিয়ে তাকে কাবু করতে পারল না সে। হাতীটা কেমন যেন মনমরা হয়ে গেল। দর্শকেরা ভাবলো গণ্ডারটারই জয় হল।

এই সময়েই দেখা গেল হাতীটা বিভ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোন কৌশলের কথা ভাবছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল এই প্রাঙ্গণেরই এক পাশে পড়ে রয়েছে একটা কাঁটার সম্মার্জনী, কোন অসতর্ক ঝাড়ুদার হয়তো আগের দিন ফেলে গিয়েছে এখানে। ঝাঁটাটা দেখামাত্রই উপস্থিত বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। মুহূর্ত মধ্যেই ঝাঁটাটাকে সযত্নে তুলে নিল তার শুঁড় দিয়ে আর ধাবিত হল গণ্ডারের দিকে। দর্শকেরা

হয়তো ভাবল, এটা আবার কি ব্যাপার? হাতীটা ঝাঁটা কুড়িয়ে কি করবে? গণ্ডারের গায়ে কি সুড়সুড়ি দেবে?

এদিকে হাতীটা ঠিক করে ফেলেছে ঝাঁটা দিয়ে সে কি করবে। নিমেষের মধ্যেই সে ঢুকিয়ে দিল ঝাঁটাটাকে গণ্ডারের একটা চোখে, তারপর আর একটা চোখে। ক্ষত-বিক্ষত হল তার দুটো চোখই। রক্ত পড়ল ঝরে। তীব্র যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে সে ছুটতে লাগল চারিদিকে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ছুটোছুটি করতে করতে বেড়ার গায়ে ধাক্কা খেয়ে সে উল্টে পড়ল মার্বেল পাথরের মেঝের ওপর।

হাতীর পক্ষে এটা হল সুবর্ণ সুযোগ। তখনই সেই ভাঙা বেড়াটাকে শুঁড় দিয়ে আরও খানিকটা প্রশস্ত করে নিয়ে গণ্ডারের কাছে গিয়ে তার মাথার উপর চাপিয়ে দিল তার মোটা একটা পা আর সেই পায়ের চাপ দিয়ে গণ্ডারটার মাথার খুলিটা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল।

এরপর শুঁড় দোলাতে দোলাতে বেড়ার পাশ থেকে এল চলে। তার ভারতীয় মাহুত তাড়াতাড়ি এক ভাঁড় মিঠাই নিয়ে ধরল তার কাছে। প্রসন্ন চিত্তে শুঁড় দিয়ে গ্রহণ করে সবটাই সে উদরস্থ করল নিমেষেই। দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে বাহবা দিল সকলেই। ভারতীয় হস্তী রোম নগরীতে রাখল এক অভূতপূর্ব কীর্তি।

এরপর মাহুতকে চড়িয়ে নিল সে তার পিঠে। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল সম্রাট অগাস্টাসের কাছে। শুঁড় উঁচু করে এক বৃংহনে সম্রাটকে জানাল অভিনন্দন আর নতজানু হয়ে প্রকাশ করল তার শ্রদ্ধা।

এই হস্তী-গণ্ডার যুদ্ধের চাক্ষুষ বিবরণ দিয়েছেন এক রোমান দর্শক। রোম সম্রাট প্রথম ক্লডিয়াস তাঁর আত্মজীবনীতে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বধূর বেশে

এক শ' সাতাশ বছর আগেকার কথা। বেহালা তখন ছিল না কলকাতার কণ্ঠলগ্ন কোলাহল-মুখর শহর। ট্রাম, বাস, মোটর গাড়ি, রিক্‌শা ছিল না, ছিল পালকি। এই পালকি-বাহনেই সেকালের গৃহস্থ বধূরা করতেন যাতায়াত।

বেহালার বারোয়ারিতলা ছিল তখন জমজমাট। রাস্তা দিয়ে কোন পালকি গেলেই তাকে আটক করে চাঁদা আদায় করত বারোয়ারিতলার জুলুমবাজ যুবকের দল। এদের কাছ থেকে নিস্তার পেত না কেউই। সঙ্গে টাকাকড়ি না থাকলে মহিলারা বিপন্ন হতেন, গা থেকে গয়না খুলে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতেন। এরা বেহালায় সৃষ্টি করে সন্ত্রাসের রাজত্ব। সেকালের সংবাদপত্রের পাতায় এই সব মস্তানদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ প্রকাশিত হয়। প্রতিকারের অজস্র দাবিও জমা হয় ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে। কিন্তু এদের দৌরাত্ম্য চলতেই থাকে।

সেদিন বারোয়ারিতলার যুবকেরা ওত পেতে বসে আছে। হয়তো তখন তারা চাঁদা আদায়ের নতুন নতুন ফন্দি ফিকির ঠিক করছে। এমন সময় দেখতে পেল একটা পালকি আসছে বারোয়ারিতলার দিকে। মস্তানেরা হৈ হৈ করতে করতে ছুটে গেল পালকির কাছে, জোর গলায় হুকুম জারি করল, 'থামাও পালকি।'

বেহারারা উত্তর দিল, 'পালকিতে জেনানা আছে।'

'থাকগে জেনানা, পালকি থামাতেই হবে', গর্জে উঠল যুবকেরা।

'পালকিতে কুলবধূ আছেন, সঙ্গে কোন অভিভাবক নেই', উত্তর দিল বেহারারা।

'বাজে কথা শুনতে চাই না আমরা, আমাদের টাকা চাই। নামাও পালকি', ধমক দিল যুবকেরা।

'সঙ্গে টাকা নেই', বেহারারা জানাল তাদের।

'বের কর্ তোদের বধূকে। টাকা আছে কিনা আমরাই দেখব।' আদেশ দিল যুবকেরা।

'আমরা পালকির ঢাকা খুলতে পারব না, শ্লীলতাহানি হবে কুলবধূর।' প্রতিবাদ জানাল বেহারারা।

যুবকেরা মারমুখো হয়ে উঠল। ইতর ভাষার ফোয়ারা ছুটল তাদের মুখে। দলের পাণ্ডা বাজখাই গলায় বললে, 'দেখাচ্ছি মজা এবার।'

তারা পালকির কাছে এগিয়ে গেল সদর্পে। খুলে ফেলল পালকির ঢাকা। কিন্তু কে বসে আছে পালকির ভেতর? কোথাকার রাঙাবউ? বেশ সেজেছে তো! গায়ে গয়নাও তো অনেক আছে! বারোয়ারি পুজোর মোটা টাকা আদায় হবে এর কাছ থেকে।

কিন্তু পালকির ভেতর যিনি বসেছিলেন তাঁকে দেখে যুবকদের হৃদকম্প দেখা দিল। কি সর্বনাশ! এ যে বেটন সাহেব, চব্বিশ পরগণার দুর্দান্ত ম্যাজিস্ট্রেট। শাড়ি পরে বধূর বেশে বসে আছেন পালকির ভেতরে। 'ওরে বাপরে' বলে কয়েকজন ছুটল বনবাদাড়ের দিকে, বাকি কয়েকজনকে হাতেনাতেই ধরলেন বেটন সাহেব সেইখানেই। তাদের চালান দিলেন কাছারিতে।

বেহালার বারোয়ারিতলায় শান্তি এল ফিরে।